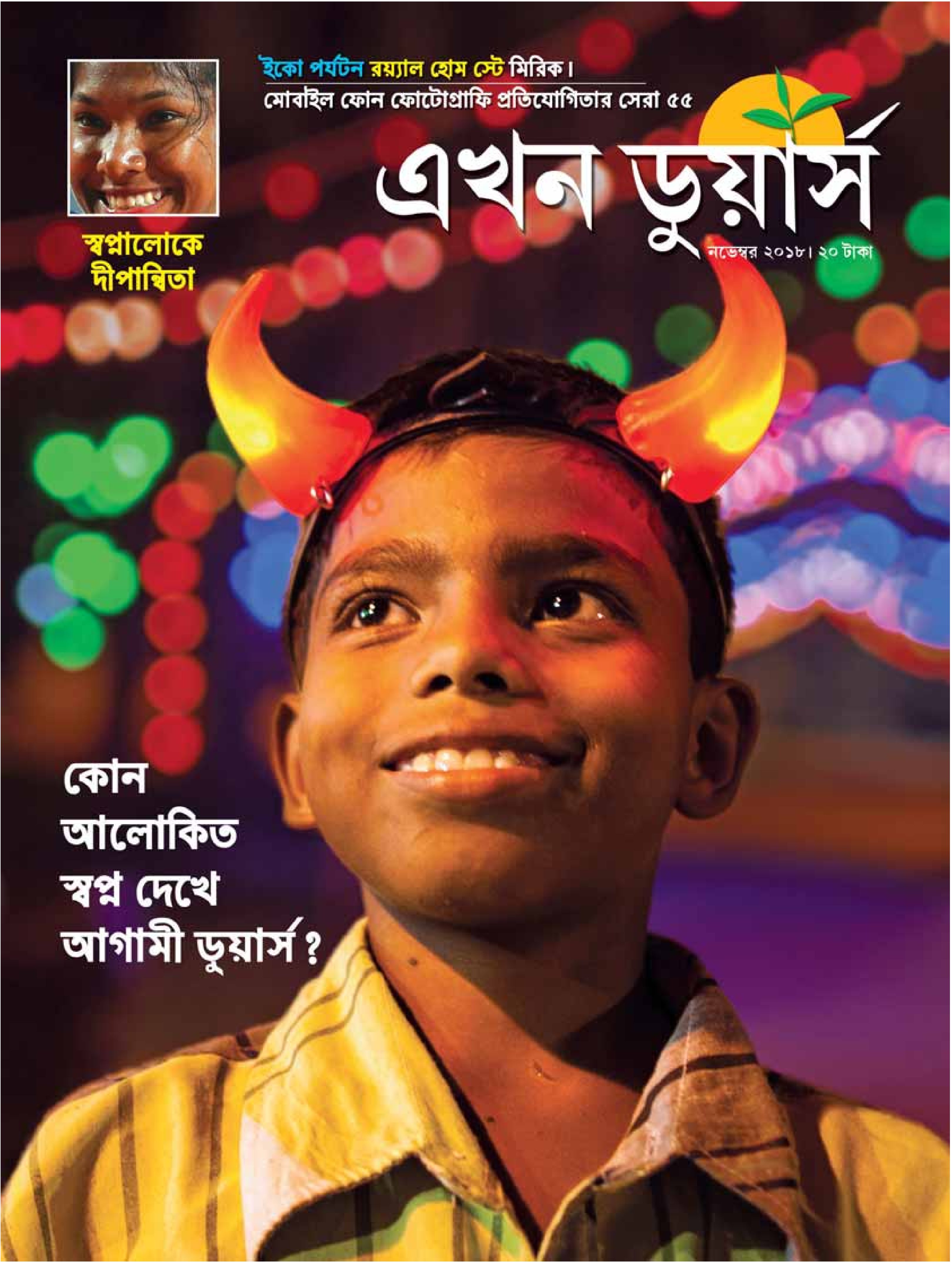

ইকো পর্যটন রয়্যাল হোম স্টে মিরিক।

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার সেরা ৫৫

এখন ডুয়ার্স

নভেম্বর ২০১৮। ২০ টাকা

স্বপ্নালোকে দীপান্বিতা

কোন আলোকিত স্বপ্ন দেখে আগামী ডুয়ার্স?

জলপাইগুড়ি পুরবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা

যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১৩৪ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌরসভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ-এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলায় খ্যাতির শিয়রে পৌঁছে দিচ্ছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভায় বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল—

১) এন ইউ এল এম— ১) শহরের গরীব মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভরদল গঠন।
২) স্বনির্ভর দলের ১.২৫ লাখ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণপরিষেবা প্রদান।
৩) স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলগত ঋণ-এর ব্যবস্থা করা।
৪) শহরের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫) শহরের আশ্রয়হীনদের জন্য ১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা।

২) হাউসিং ফর অল (এইচ এফ এ)— ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ১২৯০টি গৃহ ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা (প্রতিটি গৃহের মূল্য) মূল্যের, পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ১৯৪৫টি পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হবে।

৩) আমরুত— ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তার জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলের উপযোগী করে শহরবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। কান্তেষরী পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জে ওয়াই এম এ পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করার কাজ চলছে।

৪) গ্রীন সিটি— ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে।

৫) এন ইউ এইচ এম— ইউ পি এইচ সি ১ (লাবন্য মাতৃসদন) এবং ২ (৩নং ঘুমটি) থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়।

৬) স্বাস্থ্যসাথী— এই প্রকল্পে ৭৫০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠির পরিবারকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আরও ৩০০০ কার্ড প্রদান করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে ১,৫০,০০০ টাকা স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করা হবে।

৭) সমব্যাথী— ৫২৯ টি পরিবারকে এককালীন ২০০০ টাকা করে পারলৌকিকক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

৮) পথবাতি— শহরের সৌন্দর্যায়ন ও আলোকিত করার জন্য ২৫ টি ওয়ার্ডে এল ই ডি লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৯) রাস্তা ও ড্রেন— ২৫ টি ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তা ম্যাস্টিক ও ড্রেনকে কভার ড্রেনে পরিণত করার কাজ চলছে।

১০) এস ডব্লু এম— প্রতিটি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ চলছে। এর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক। ধন্যবাদান্তে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ
গৌতমেন্দু রায়

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৫

বিশেষ রচনা
দিওয়ালি ও মণ্ডপসজ্জার আতিশয্যে কালীপূজা হারিয়ে যায়! ৮
ভূত চতুর্দশীর রাতে তেনারা নেমে আসেন মর্তে! ১০

পাঠকের কলমে
বেনারসে রাজ ঐতিহ্য মণ্ডিত কোচবিহার কালীবাড়ির ভগ্নদশা আমাদের লজ্জিত করে না? ১৫

ডুয়ার্সের হেথা হোথা
বেলাকোবায় একবেলা ১৮

পর্যটন
রয়্যাল হোম স্টে ২৮

শ্রীমতি ডুয়ার্স
স্বপ্নালোকে উত্তরের দীপান্বিতা ৩১, সম কাজে সম বেতন ৩৩
পাথরঝোড়ার মেয়েবেলা ৪২

চিকিৎসকের মুখোমুখি
জর্দা পান সুপুরির উত্তর বাংলায় মুখের মারণ রোগ বেড়েই চলেছে ৩৪

হাংরি রিপোর্টার
যে জলপ্রপাতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম ৪৪

প্রতিবেশি পিএনপিসি
কালিয়াগঞ্জের বুলন ও শোলা শিল্পীরা ১২, ও মহানন্দা তুমি বইছ কেন? ১৩

বইপত্র সাহিত্য
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪

বন্যপ্রাণ সপ্তাহে
বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করাই আসল কাজ! ৩৮

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
মহারাণী কথা ৩৬, লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর ৩৯

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬, ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ১৬, রাসায়নিক রস ৪৬

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮
সেরা ৫৫ জন ২০

Resort Sonar Bangla
Gorumara National Park
Phone: 03561-266558, +91 8348228111 mail: tirthankar_18@rediffmail.com

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসত্তা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

সম্পাদকের কলমে

কোন সে আলোর অপেক্ষায় আগামী প্রজন্মের ডুয়ার্স?

এ কোনও পুরাকালের কথা নয়, মাত্র সত্তর বছর আগের কিছু পরিসংখ্যান। নিজেদের বয়সের নিরিখে আজ সত্তর বছরকে কি অনেক আগের বলা যায়? তখন দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু আয় সর্বাধিক, সাক্ষরতায় দ্বিতীয় স্থান। কৃষি শিল্প খনিজ পরিবহণ ইত্যাদিতে সব মিলিয়ে মোট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের পরেই, যে রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় তিন গুণ বড়। শিল্পপণ্য উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল এই রাজ্যেই। সংস্থাগুলির স্থায়ী মূলধন বা নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা মহারাষ্ট্রের তুলনায় কিছু কম থাকলেও, কৃষি উৎপাদনে মারাঠা রাজ্য থেকে পঁচিশ শতাংশ এগিয়ে ছিল আমাদের বাংলা। এখানেও মনে রাখতে হবে আকারে জনসংখ্যায় অনেক বড় রাজ্য মহারাষ্ট্র। শুনলে বিশ্বাস হয় আজ? আজকের বাংলার পাঠককে এই পরিসংখ্যান কি খানিক অবাক করছে না? সত্যিই তো, এতটা এগিয়ে থাকার কথা ছিল না! কারণ টানা ১৯০ বছর ব্রিটিশদের ক্রমাগত লুণ্ঠন ও শোষণে এবং দেশভাগের রক্তক্ষরণে কিছুই তো অবশিষ্ট থাকবার কথা নয় রাজ্যটির।

প্রাক-ইন্টারনেট বা প্রাক-মোবাইল ফোনের সে মান্ধাতা কালে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের সেই গরবিত পরিসংখ্যানই বোধ হয় কাল হয়ে দাঁড়াল এই রাজ্যের, যার পরিণামে আজ বাংলা সবার পেছনে। বাংলা তথা পূর্ব ভারত যথেষ্ট এগিয়ে আছে অতএব এখন বাকি ভারতের উন্নয়নে মনযোগ দাও— স্বাধীনতার পর দিল্লিওয়ালাদের এই নীতিই বাংলার ভাগ্যাকাশে ডেকে নিয়ে এল বঞ্চনার কালো মেঘ, যা আজও কাটল না! বৈষম্যের শিকার হতে শুরু সেই থেকেই। স্বাধীনতার পর দিনই বোঝা গেল পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব আয়ে দুটি বড় ঘা দিয়েছে দিল্লি— পাটজাত পণ্যে রপ্তানি শুল্ক থেকে এবং আয়করের বিভাজ্য তহবিল থেকে এ রাজ্যের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে দিয়ে সেই ব্রিটিশদের রাজস্ব নীতিই বহাল রাখা হল। অজুহাত দেওয়া হল দেশভাগের।

গত সত্তর বছরে একটা জাতিকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দেউলিয়া করে দেওয়ার পেছনে যে সুগভীর চক্রান্ত কাজ করেছিল তার ব্যাখ্যা খুঁজবেন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা, তবে দিনকাল অনেক পাল্টে গিয়েছে। তামাদি হয়ে যাওয়ার পথে পুরনো শাসকেরা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গনে দাদাগিরির জন্য সংসদে যে ম্যাজিক ফিগার চাই কিংবা যে করিডোর প্রয়োজন, পূর্ব ভারতকে গুরুত্ব না দিয়ে তা আজ আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়, দিল্লিওয়ালারা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

অন্যদিকে দেশভাগের ফলে উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যাতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মতই নাজেহাল হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল কেন্দ্রের দু'মুখী নীতিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা যে পরিমাণ পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা পেল, তার কিয়দংশও জুটল না পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের। পূর্ববাংলা থেকে ১৯৭০ সাল অব্দি এ রাজ্যে আসা পঞ্জীভুক্ত উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাহান্ন লাখ, তারপরে রয়েছে নাম না লেখানো উদ্বাস্তু বা বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা, যাদের সংখ্যা মন্দ নয় মোটেই। পশ্চিমের শরণার্থীরা ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল নানা রাজ্যে, সেখানে নানা শিল্পে কর্মসংস্থান মেলে তাদের, কৃষিক্ষেত্রে অবারিত সাহায্য ও সুযোগ পঞ্জাবকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। সেখানে পূবের রিফিউজিদের জন্য পড়েছিল অনুন্নত আসাম ও ত্রিপুরা। বিহার জমি দিতে রাজি হয় নি, আন্দামানের পথ সামান্য কিছু পরিবারকে পাঠিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বদলে তাদের জন্য নির্বাচন করা হয় ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র জুড়ে বিশাল দণ্ডকারণ্যের দুর্গম ভূমি। কিন্তু সেখানেও সরকারের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কোনও মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে নি পুনর্বাসন মন্ত্রক। কেন্দ্রের গঠিত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদ আগাগোড়া ঠুঁটো হয়েই পড়ে রইল, উপরন্তু দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা প্রথমে পয়ত্রিশ হাজার পরিবার ধার্য হলেও ক্রমে তা নেমে এল সাত হাজারে। সবাই জানল, ঘরকুনো বাঙালি বাংলার চৌহদ্দি ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না!

অজুহাতের পর অজুহাত দিয়ে বাংলার এতদিনের প্রাধান্যকে ক্রমশ খর্ব করার খেলায় নেমে পড়ল পুরো হিন্দি বলয়। দেশভাগের ট্র্যাজেডি ঘটবার পর সরকারি নীতিতে শিল্পের জন্য সীমান্তবর্তী এলাকার চাইতে আভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হল নিরাপত্তার অজুহাতে। কলকাতার গায়ে তখন দেশভাগের কলঙ্ক, স্বভাবতই শিল্পের বিকাশে ব্রাত্য রইল পশ্চিমবঙ্গ। শিল্প-লাইসেন্স দেওয়া তুলনায় বেড়ে গেল মহারাষ্ট্রে, সেই সঙ্গে বিনিয়োগও। দিল্লিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি বোম্বাইকে অর্থনৈতিক ক্যাপিটাল হিসেবে গড়ে তোলবার সুচারু প্রয়াস তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। তুলাবস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং কৃষিতে চিনি উৎপাদনে প্রভূত পরিমাণে সরকারি সাহায্য শুরু হলে তরতর করে এগিয়ে এল মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। বাংলা পড়ে রইল চোদ্দ হাত জলের তলায়। বিনিয়োগ স্বভাবতই সরতে শুরু করল বাংলা থেকে। কেন্দ্রের বৈমাত্রেয় আচরণ ও জনসংখ্যা স্ফীতির একযোগে আক্রমণে ধ্বসে পড়তে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। অর্থনৈতিক সংকটে সেসময় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক স্থিরতা দেওয়ার চেষ্টা করে নি দিল্লির শাসকেরা, ফলে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। ধ্বংসের পথ সূচিত হয়েছিল তখন থেকেই।

কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে ক্রমাগত সোচ্চার হতে দেখেছি বাম সরকারকে, রাজনৈতিক মতলবের গন্ধ থাকায় এ নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও কম হয় নি! কিন্তু বাস্তবে জ্যোতি বসু প্রথম বা একা নন, দিল্লির কাছে তার আগেও বারবার রাজ্যের সংকট নিয়ে দরবার করেছেন বিধান রায় বা প্রফুল্ল সেনরা, কিন্তু দিল্লির সরকার বা শাসক দল সেসব নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় নি। পুরনো সাংবাদিকরা বলেন, শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরে দীর্ঘদিন বাংলার কোনও জোরালো প্রতিনিধিত্বও সংসদে ছিল না। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও সেই কেন্দ্রীয় বৈষম্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। গোটা বাংলা আজও কেন্দ্রবিরোধী সুরে কথা বলে। গত সত্তর বছরে একটা জাতিকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দেউলিয়া করে দেওয়ার পেছনে যে সুগভীর চক্রান্ত কাজ করেছিল তার ব্যাখ্যা খুঁজবেন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা, সেইদিন হয়ত বা আমাদের কর্মবিমুখ ভীতু ঘরকুনো রাজনীতি-সর্বস্ব বদনাম কিছুটা ঘুচবে।

তবে দিনকাল অনেক পাল্টে গিয়েছে। তামাদি হয়ে যাওয়ার পথে পুরনো শাসকেরা। যে বৈষম্য নীতির ফলে সে সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল গোটা পূর্ব ভারত, সেই নীতির পরিবর্তন ঘটছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গনে দাদাগিরির জন্য সংসদে যে ম্যাজিক ফিগার চাই কিংবা যে করিডোর প্রয়োজন, পূর্ব ভারতকে গুরুত্ব না দিয়ে তা আজ আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়, দিল্লিওয়ালারা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। কিন্তু টানা সত্তর বছর ধরে ক্রমাগত ক্ষয় ভরাট হবে কতটুকু? জনসংখ্যার চাপ কমবে কোন যাদুমন্ত্রে? পাট, চা ও অনুপ্রবেশ— এই তিন গভীর অসুখে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যে আমাদের এই উত্তর বাংলা, এ নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। কর্মহীনতা, সরকারি ভাতায় মোচ্ছব, শিক্ষাপ্রাঙ্গন বধ্যভূমি, গোষ্ঠী দাঙ্গার মারণ রূপ— মাদকাচ্ছন্ন ডুয়ার্সের নতুন প্রজন্ম তবু তাকিয়ে থাকে কোনও আলোক রেখার অজানা আশায়— এসবের মধ্যে থেকেও উত্তরণ চায় এক আশ্চর্য আগামীতে।

দিওয়ালির মেগা খুচরো

খুচরো লেখকের লেঙ্গি হইয়াছে। চিকিৎসক কহিয়াছেন, 'দেখুন কলমবাবু! ড লিখিতে পারিব না, তাই ল লিখিতেছি। ইচ্ছা করিলে ভেঙ্গি, এমন কি এঙ্গি বলিতে পারেন। তবে যে নামেই ডাকুন, মেডিসিন একই।' শুনিয়া ভাবিলাম, কাজ বাড়িল। খুচরা লিখিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সদ্য বিজয়া দশমী গিয়াছে। হ্যাপি হ্যাপি মেসেজে মোবাইল ফাটো ফাটো। এইবার বৈকুণ্ঠপুর রাজধানীর বিখ্যাত মহালয়া উৎসবে শব্দপটকা ফাটাইবার বিরুদ্ধে প্রশাসন এমন ফতোয়া জারি করিয়াছিল যে উৎসব প্রায় ফ্লপ। তা বিজয়া একাদশীর দিন জুনিয়ারদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া মহাতামাক সেবন করিতেছি, হেনকালে বসুনিয়া দারোগা আসিয়া কহিল, 'গতকল্য রাবণহত্যা দেখিতে যান নাই? রাবণ হেভি ফাটিয়াছে!'

কল্কেগ্রাম কলিকা সমিতির নব সদস্য হরিরাম অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিয়া দারু ছাড়িয়া মহাতামাক ধরিয়াছে। দারোগার বাক্যে কটাক্ষ হানিয়া কহিল, 'ফাটিয়াছে মানে? আপনারা তো ফাটাফাটি নিষিদ্ধ করিয়াছেন! টাউনের ইতিহাসে এই প্রথম সারমেয়রা মহালয়ার রাতে নিশ্চিন্তে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে! সাইলেন্ট মহালয়া দেখিয়া উহারা ঠিক করিয়াছে যে আগামি ভাদ্র অবধি প্রশাসনিক ব্যক্তিদের কামড়াইবে না। পাগল হইলেও না। অথচ রাবণ মার্ডারের সময় আপনারা শব্দপটকা ফাটাইয়া উহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন?'

দারোগা উদাস হাসিয়া কহিলেন, 'দুই দিনের বালিকা, ছিলিম রে কও কলিকা! শব্দবাজি ছাড়া রাবণ ফাটিবে কী ভাবে? লোকসভা দুয়ারে কড়া নাড়িতেছে। রামের দল পদ্মফুলে চড়িয়া ঘাসফুল কাটিতেছে। আর তুমি কহিতেছ মহালয়ার শব্দবাজি ফাটে নাই বলিয়া রাবণহত্যার কালেও ফাটিবে না? শোনো বৎস্য! ইহা

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। প্রশাসন কী ফাটাইবে না ফাটাইবে তাহাতে পাব্লিকের কী?'

অমনি লাগিয়া গেল। টিভিতে 'একঘন্টা সঙ্গে মন্টা', 'মুখোমুখি গালিগালাজ', 'টগবগে টক শো' ইত্যাদি দেখিয়া ইদানিং কেহ আর কাহাকে কিছু বলিতে দেয় না। নিজেরাই বলে। ফলে হুলুস্থুলু বাধিয়া গেল। এই অবকাশে আমি খাতা খুলিয়া খুচরোর প্রথম পরিচ্ছেদ লিখিতে লাগিলাম।

ননবেলেবেল পাতা

ফাটাপুকরের নিকট কোথায় জানি এক গেরস্ত বাজারে গিয়াছিলেন বেল পাতা কিনিবার তরে। সকলেই জানেন যে লক্ষ্মীপূজার ফুল-বেলপাতা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। অনলাইনেও নাকি মিলিতেছে আজকাল। তা যুবক গেরস্ত দশ টাকার পাতা কিনিয়া বাড়িতে বসিয়া সিরিয়াল দেখিতেছিল। পুরোহিত আসিয়া পূজায় বসিয়াছে। অকস্মাৎ শোনা গেল পুরোহিতের হুঙ্কার! গেরস্ত ঠাকুর ঘরে ছুটিয়া গিয়া দেখে বউ কাচুমাচু বদনে বসিয়া আছে। পুরোহিত টিকি নাচাইয়া কহিতেছে, 'ইয়ার্কি হইতেছে! ইহা বিল্বপত্র? লক্ষ্মীকে তুষ্ট করিয়া ডিএ পাইবার আশা করিতেছ, অথচ বিল্বপত্র চেনো না?'

জানা গেল দশ টাকা খরচ করিয়া গেরস্ত বুনো তুলসীর পাতা কিনিয়া আনিয়াছে। গেরস্ত তক্ষুনি বাইক লইয়া ছুটিলেন বিক্রেতার উদ্দেশ্যে। সব শুনিয়া বাজারের পাব্লিক খ্যাক খ্যাক করিয়া হাসিয়া কহিল, 'ও ব্যাটা আবার পরের লক্ষ্মীপূজার দিন বসিবে। পাতা ফ্রিজে রাখিয়া দিন। নেক্সট টাইম ফেরৎ দিবেন।'

পূজার হিসেব

প্রশাসনিক পটকা ফাটিবে কি ফাটিবে না সে বিষয়ে আলোচনা প্রায় ঝগড়ায় পরিণত হইয়াছে। প্রায় সকল সদস্য যোগ দিয়েছে ঝগড়ায়। কেবল স্বঘোষিত ঐতিহাসিক শকাব্দ সান্যালকে দেখিলাম মন দিয়া 'দৈনিক আত্মীয়' পত্রিকা পাঠ করিয়া নোটবুকে কী জানি লিখিতেছে। বলিলাম, 'ঝগড়া না করিয়া কী আলবাল লিখিতেছ?' সে কহিল, 'পূজার হিসাব দাদা!'

'পূজার হিসাব তো কমিটির কাছে থাকে জানিতাম।'

শকাব্দ সান্যাল নোটবুক রাখিয়া ছিলিম উঠাইয়া ধূম্র গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া কহিল, 'ভাবিয়া দেখুন! গত বৎসর গগন সাঁপুই-এর বাড়ির দুর্গাপূজা লইয়া 'দৈনিক আত্মীয়' লিখিয়াছিল সাড়ে চারশত বৎসরের পূজা। এই বছর লিখিয়াছে পাঁচশত বৎসর হইল। ফি বৎসর পঞ্চাশ বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে কী করিয়া তাহাই তদন্ত করিতেছি। তাহার পর দেখুন, রণহুঙ্কার বান্ধব সমিতির পূজা শুরু হইয়াছিল রাজ্যে বামফ্রন্ট আসিবার বছরে। এই বৎসর নাকি তাহাদের গোল্ডেন জুবিলি।'

আমি কিছু বলিতাম। কিন্তু তাহার আগেই ঝগড়া ছাড়িয়া নব্য রামপন্থী সদস্য হাঁউমাউ করিয়া প্রোটেস্ট করিয়া কহিল, 'দুর্গার বয়স লইয়া সন্দেহ! কই, ইদ-মহরম

আসিলে তো বছরের হিসাব করো না!'

কোন্দল নতুন পথে ঘুরিয়া গেল। এই অবস্থায় খুচরা লিখিব কী ভাবে? তাই সমিতি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আবার পটকান্ড

জলদাপাড়া জঙ্গলে গিয়া পরম নির্জনতা পাইব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু এ কী! লম্বা লম্বা নল হাতে কাহারা ছুটিতেছে আর ভয়ানক শব্দে পটকা বিস্ফোরণ ঘটাইয়া প্রাণীকুলকে চমকাইতেছে!! এদিক ওদিক চাহিয়া এক নলবাহীকে পাকড়াও করিয়া কহিলাম, 'ব্যাপার কী হে? জঙ্গলে শব্দবাজি পোড়াইতেছ কেন? গম্মেন্ট কি রামাক্রমণ ঠেকাইতে ফরেস্টে রাবণবধ করিতেছে?'

শুনিয়া সে মহাশ্চর্য হইয়া কহিল, 'জানেন না বুঝি? গম্মেন্ট আমাদিগের দীর্ঘনলা বন্দুক দিয়াছে। নলাগ্রে ক্র্যাকার ফিট করিয়া ফাটাইলে সে-ই আওয়াজ হয়। মনে হয় প্যান্টে হিসি হইয়া যাবে!'

'কেন কেন?' আমি আকুল হইয়া যাই।

'নর্মাল পটকায় হাতিরা আর ভাগছে না সার! তাই এটা।'

আমি খাবি খাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল ২০২৫ নাগাদ হাতি তাড়াইতে গ্রেনেড ফাটান হইবে। কী কান্ড! টাউনে মহালয়ার রাতে দুম-দাম বাজি বন্ধ। দেয়ালিতে ঘণ্টা দুয়েক বাজি চলিবে। অথচ হাতি তাড়াইতে দড়াম-দুড়ুম বৈধ! হাতি যদি ফসল খায় তবে খাইতে দিলেই তো হয়। বদলে কৃষককে পয়সা দিবে। হাতির খাবার খরচা বাবদ গম্মেন্ট তো টাকা দেয়। কে খায় সে সব?

পলিটিকাশ

মানে, পলিটিকাল কাশ। ডুয়ার্সে রাজনৈতিক ময়দানে পূজার সময় পলিটিকাল কাশ ফুল ফুটে। তাই পূজাকালে পলিটিকাল খবরে কোনো খোরাক নাই। কোনো গোষ্ঠি ফাইট নাই, তৃণপদ্ম দ্বন্দ্ব সমাস নাই, লাশ পড়িতেছে না, বোমা ফাটিতেছে না, বিরোধী চক্রান্ত ভ্যানিশ। সকলে মন দিয়া পূজা উদ্বোধন করিতেছে। খবর পাইলাম, ময়নাগুড়িতে নাকি দেয়ালির হাওয়া উঠিলে এমন নীলসাদা আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিবে যে গেরুয়াকুল হারুয়া হইতে তাল পাইবে না। কিন্তু ইহা নিরামিষ খবর। সব গোষ্ঠি মানিয়া লইয়াছে। তদুপরি গেরুয়া আলোক খুব একটা উজ্জ্বল হয় না বলিয়া বিরোধিরাও চুপ। লাল আলোকের তো প্রশ্নই নাই। উহা নাকি আগেই জ্বলিয়া গিয়াছে। তাই গম্মেন্ট মনের সুখে ময়নাগুড়িতে নীলসাদা এলইডি স্থাপন করিতেছে।

খবর লইয়া কয়েকখানি বিজয়া সম্মিলনীর কথা জানিলাম। সেখানেও অপূর্ব শান্তি। শুনিলাম, তলে তলে নাকি কালীফাইট হইতেছে। কে কোথায় কেমন ঘটা করিয়া পূজা করিবেন, তাহারই নাকি কম্পিটিশন চলিতেছে এখন। কিন্তু পূজা কমিটির মধ্যে হাতাহাতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপ শান্তি বজায় থাকিলে খুচরো লেখকের চলিবে কী ভাবে? পূজা ফুরাইলে বাঁচি! তবে কানাঘুষায় জানিলাম দেবীপক্ষে গোষ্ঠি ফাইট নাকি রাজধানী এক্সপ্রেসে চাপিয়া সিবিআই আপিসে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সত্যি নাকি?

মরেচে

যাও বা একখানা সিঙ্গল লেনের জাতীয় সড়ক ছিল সেটাও বুঝি গেল। মহাসড়কের আগমন উপলক্ষ্যে উহা জায়গায় জায়গায় ফোর বাই থ্রি-এর বি গণেশ মোহন লেনে পরিণত হইয়াছে। কোথাও কোথাও বোধ হয় ঘুমচোখে ভুল করে কেউ চাষ করে গেছে ধান রুইবে বলিয়া। পনের কিলো যাইতে এক ঘণ্টা লাগিতেছে। তা পাব্লিক ভাবিতেছিল, চারপাশে যা কর্মকান্ড হইতেছে, মহা মহা যন্ত্র দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, মহা সড়ক হইতে আর বাকি কী? কিন্তু যা খবর পাইলাম তাহাতে মহাতামাকের মৌতাত দূর হইয়া গিয়াছে! ছত্রিশ মাসে মোটে ছয় কিলো রাস্তা জাতীয় হইতে মহা হইয়াছে। জমির ক্যাচাল মিটে নাই আবার নাকি মাটিও মিলিতেছে না! ভাবিয়াছিলাম কোচরাজ্যে রাসমেলা দেখিতে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছাইয়া ভেটাগুড়ির জিলিপি খাইয়া রিটার্ন আসিব, সে গুড়ে বালি পড়িল। ছত্রিশ মাসে ছয় কিলো হইলে চুরাশি কিলো কবে হইবে? ততদিনে কলিকা গ্রাম কক্ষে সমিতির উদ্যোগে আমার স্মরণে টুর্নামেন্ট শুরু হইয়া যাইবে যে!

যাহা হউক। এখন আমি নিজেই নিউজিকাল পোয়েট্রি লিখিতে পারি। নিম্নে দিলাম।

১। কন্ডাক্টরের সহিত গন্ডগোল/ ড্রাইভার চাবি লয়া গেলা চলি অজ্ঞাতবাসে/ সংবাদ শালবাড়ি হতে/ যাত্রী কাতর পথমাঝে হায়!

২। খ্যাপা কুকুরের পাশে/ দাঁড়াইল আহা কোতয়াল/ ধূপগুড়ি জনপদে শুনি।

৩। চামুর্চির কাছে/ সতীনে সতীনে যুদ্ধ হেরিয়া/ ক্লান্ত স্বামী/ গেলা থানায় সটান/ 'মোরে ভরো জেলে' দাবী নিয়া/ দিয়াছে পুলিশ ফেরৎ তাহারে/ প্রচুর বুঝাইয়া।

৪। আলিপুরদুয়ারের পথ/ করিয়াছে টোটোদল আমূল দখল তাই/ পাব্লিক খাবি খায় হন্টনের তরে।

৫। কোচরাজ্যের কাছে টাকাগাছ আছে/ সেইখানে বধূ বেশি দাম পেয়ে/ বেচে দিল স্বর্ণালঙ্কার হায়/ স্বামী ফিরি দেখিলা হতাশে/ টাকাগুলি জাল।

দেয়ালির শুভেচ্ছা। পরিশেষে কবিতিলক পুরন্দর ভাটের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। ঘটনা তিস্তাব্রিজের নিকট।

'ট্রাকের উপর সব্জি/ রহে তাজা তাজা/ তাহার নিচেতে ছিল/ কেজি কেজি গাঁজা।'

কলম সিং

ছড়রা

ডানপিটে

মধ্যরাতে মদ্য হাতে
ছুটছে বাইক শব্দ বেগে!
দামাল ছেলে বেসামাল
উঠছে পাড়া আঁতকে জেগে!

পুলিশ আসে ফুলিশ হাসে
স্টিকার সাঁটা নোকরি বাঁচা!
সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ
আপনা পরাণ আপনা চাচা!

দুম দমা দম ফাটছে যে বোম
দিওয়ালি কি বচ্ছরভর!
না গো খুড়ো যুব বুড়ো
করছে লড়াই পুড়ছে যে ঘর!

কলেজ মাঠে হাড়িকাঠে
চলছে বলি ছাগশিশু!
নলেজটা কম কলজে বেদম
আক্কেল কি জানো কিসু?

নেতা খাটেন ফিতা কাটেন
ওসব কোনও হয় নি মোটে!
দুষ্টুরা তো শাস্তি পাবেই
আইন চলছে ফাইন বটে!

সনাতন চন্দ

(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক সময়। ইমেল: editor.ekhonduars@gmail.com)

বিশেষ রচনা

দিওয়ালি ও মণ্ডপসজ্জার আতিশয্যে কালীপূজা হারিয়ে যায় !

আয়ান ঘোষ খুব বিব্রত। রাধার কারণে। কৃষ্ণপ্রেমে মজে আছেন তিনি। স্ত্রী ভাগিনার সাথে গোপন অভিসারে মিলিত হন ইতি উতি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছেন না বলে কিছু উপায় হচ্ছে না। জটিলা কুটিলা কে নিযুক্ত করলেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু সে দুজনের সাধ্যি কী রাধাকে চোখে চোখে রাখেন। উপায়ন্তর না পেয়ে আয়ান স্থির করলেন নিজেই লক্ষ্য রাখবেন রাধার গতিবিধি। তিনিও যে খুব কায়দা করতে পারছেন তা নয়। হঠাৎই এক অমাবস্যায় গোপন সূত্রে সন্দেশ পেলেন আজ রাতে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে চলেছেন কুঞ্জবনে। সঠিক সময়ে আয়ান পিছু নিলেন তাঁর। পথমাঝে হারিয়েও ফেললেন তাঁকে। এলোমেলো ঘুরে শেষে পৌঁছলেন কুঞ্জবনে। এরপর তিনি যা প্রত্যক্ষ করলেন তা তাঁর কাছে অভাবনীয়। তিনি দেখলেন রাধা মাতা কালীর পুজো করছেন। বিভিন্নভাবে দেখলেন। তিনি কিন্তু কৃষ্ণকে কালীরূপেই দেখতে পেলেন সে রাতে। আর রাধা করছেন কৃষ্ণ আরাধনা। কৃষ্ণের একই অঙ্গে দুই রূপ। তাইতে তিনি কৃষ্ণকালী বা কালীকৃষ্ণ। সে অমাবস্যার রাত ছিল কার্তিক মাসের। এই কাহিনিটি প্রচলিত জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে। চোর-চুন্নী পালাতেও এই কাহিনির নাট্যাভিনয় আমরা দেখেছি। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের নানাবিধ মতামত রয়েছে। সেসব এ রচনায় আলোচনার নয়।

গণেশের পরেই যে দেবী সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনি মা-কালী। শ্যামা নামেও তিনি সমধিক পরিচিত। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে তাঁর আরাধনা ভক্তিভরেই করা হয়। সারা বছর তিনি পুজো পান ভক্তের কাছে। এই ঠাকুরের যত সংখ্যায় থান-স্থান-মন্দির আমরা দেখি আর কোনও দেবদেবী তার ধারে কাছে পৌঁছাতে

গণেশের পরেই যে দেবী সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনি মা-কালী। শ্যামা নামেও তিনি সমধিক পরিচিত। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে তাঁর আরাধনা ভক্তিভরেই করা হয়। সারা বছর তিনি পুজো পান ভক্তের কাছে। এই ঠাকুরের যত সংখ্যায় থান-স্থান-মন্দির আমরা দেখি আর কোনও দেবদেবী তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। হ্যাঁ, শনি দেবতার কিছু পপুলারিটি বেড়েছেইদানিং। তবুও কালীর থেকে পিছিয়েই আছেন। কালী আছেন নানা রূপে।

সেবকেশ্বরী, ছবি বাপী ঘোষ

পারবেন না। হ্যাঁ, শনি দেবতার কিছু পপুলারিটি বেড়েছে ইদানিং। তবুও কালীর থেকে পিছিয়েই আছেন। কালী আছেন নানা রূপে। রামকৃষ্ণের 'জয় মা' বামাক্ষ্যাপার 'মা তারা' রামপ্রসাদের 'মা আনন্দময়ী' একই হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পৃথক। শনি বা গণেশ-কে রূপের দিক দিয়ে তিনি কয়েক গোল দিয়ে রেখেছেন বহু আগেই। এমনকি স্বয়ং ভোলা-মহেশ্বর অনেক পিছিয়ে আছেন। বসৎভিটে-শ্মশান-সর্বজনীন মন্দির-রাস্তার পাশে কোথায় নেই তিনি। আছেন বিভিন্ন রূপে। ভদ্রকালী-শ্মশানকালী-যোগমায়া-শ্যামা-ছিন্নমস্তা এমন কত রূপ তাঁর।

দেবী কালিকা কালী রূপে পরিচিত। কালকে যিনি গ্রাস করেন বা হরণ করেন। কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। ঘোর কৃষ্ণ কালে অশুভ শক্তি বিনাশ করে নতুন আলোকের ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দেন এ ধরাতল। তাই দীপাবলি। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় আরাধ্য দীপান্বিতা কালী। কালীকে কেন্দ্র করে জনশ্রুতি— সে এক অন্ধকার সময়। এরই মাঝে ক্রোধে উন্মত্ত এক নারী দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছেন। তাঁর অস্ত্রের আঘাতে খসে পড়ছে অজস্র নরমুন্ড। তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য স্বয়ং মহাদেব শবরূপে শয্যা নিলেন পথে। হিমশীতল এই শিব-শরীরে পা পড়তেই উন্মত্ত এই রমণী স্থির হয়ে গেলেন। লজ্জায় জিভ কাটলেন। পেলাম আমরা দেবী কালিকার এই রূপ। দীপাবলিতে এই কালীর পুজো হয় বলেই তিনি দীপান্বিতা কালী। কালীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আমরা পেয়েছি।

"কালী করালবদনা ঘোর মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুন্ডমালা বিভূষিতা দেবীর অধঃহস্তে সদ্য ছিন্ন মুন্ড, ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ, আর দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধহস্তে 'অভয় মুদ্রা' এবং অধঃহস্তে বরমুদ্রা। দেবী মহামেঘ-প্রভা শ্যামা দিগম্বরী। দেবীর কণ্ঠস্থিত মুন্ডমালা থেকে বিগলিত রুধির-ধারায় তাঁর দেহ চর্চিত। দুটি দেবশিশু দেবীর কর্ণভূষণ হওয়াতে তাঁকে ভয়ঙ্করী দেখাচ্ছে। তিনি ঘোরদ্রংষ্টা করাল আস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা। তাঁর কাঞ্চি শবহস্ত নির্মিত। তিনি হাস্যময়ী। দেবীর দুই ওষ্ঠাধর হতে রক্তধারা বিগলিত হওয়ায় তিনি দীপ্ত বদনা। মহারৌদ্রী শ্মশানবাসিনী দেবী ঘোররবকারিণী, তিনি ত্রিনয়না। ...তিনি দন্তুরা। তাঁর কেশরাশি ডান দিকে এলায়িত, তাতে মুক্তা খচিত। দেবী শবরূপী মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতি নিয়ত। তিনি সুখপ্রসন্না বদনা এবং তাঁর মুখপদ্ম ঈষৎ হাস্যযুক্ত।" (স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতার কালীমাতার ধারণা আলোচনা করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে)। আমাদের বাংলায় যে কালী মূর্তি প্রভূত জনপ্রিয় তিনি দক্ষিণাকালী। বর্ণনা পাওয়া যায় কালীতন্ত্র নামক মূল তন্ত্রগ্রন্থে। আরও

রূপভেদের প্রকার আমরা পাই পুরাণে। এলাকা বিশেষেও রূপ বদলে যায়। সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশান কালী, মহাকালী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আমরা পাই বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে। কালীর রূপভেদে পূজা পদ্ধতিও আলাদা হয়ে থাকে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনায় আমরা পাই— "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পৌত্র দীপান্বিতা কালীপূজা প্রচারের জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র হুকুম দিয়াছিলেন— তাঁহার প্রত্যেক প্রজাকে এই পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্যথা গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। এই নির্দেশের ফলে নদিয়া জেলায় প্রতি বৎসর দেওয়ালী উপলক্ষে দশহাজার কালীপূজা হইত। মনে হয় দীপান্বিতা কালীপূজার প্রচলন সে সময় খুব বেশি ছিল না। তাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই চেষ্টা। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ১৭৭৭ সালে রচিত তাঁহার শ্যামাসপর্যাবিধি গ্রন্থে যেভাবে নানা প্রমাণ সহযোগে কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনিও বহু প্রচলিত ওই উৎসবের প্রচার কামনায় ইহার গৌরব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার প্রাচীনতা যাহাই হউক না কেন, দীপান্বিতা কালীপূজা আজ বাংলাদেশে একটা মস্ত বড় উৎসবে পরিণত হইয়াছে— বাংলার বাইরের দেওয়ালি ও বাংলার কালীপূজা এই দুইয়ের সমন্বয়ে এই উৎসব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।"

কালীঠাকুরের সঙ্গে বীরত্বের-বিক্রমের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি ডাকাত-দল অভিযানে বেরনোর আগে কালীপুজো করেই রওনা হয়। এরা স্বাভাবিক ডাকাত নয়। ডাকাতি করা তাদের শুধুমাত্র পেশার তাগিদেই নয়। ধনীর সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াও তাদের অত্যন্ত জরুরি কাজ। মতান্তর আছে। এ প্রসঙ্গে ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরাণী সহ অনেকেই আমাদের পরিচিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশীদের জেহাদের সঙ্গে কালীর সম্পর্ক রয়েছে। নিয়ম করে কালীপুজো করতেন অনেক স্বদেশী। এতে স্থির লক্ষ্যের মন যেমন তৈরি হত তেমনই আত্মবিশ্বাসও দৃঢ় হত বলে ধারণা।

প্রায় সকল কবি গীতিকার তাঁদের রচনা নিবেদন করেছেন পরমেশ্বরের উদ্দেশে কোনও না কোনও সময়। সবটা সবসময় আধ্যাত্মিক রচনা যে হয়েছে তা নয়। অনেক সময়ই পরমেশ্বর হয়ে উঠেছেন তাঁদের ঘরের মানুষ, প্রাণের মানুষ। পরমাত্মীয় বন্ধু রূপেও কল্পনা করেছেন। ভাল বেসেছেন, অভিযোগ জানিয়েছেন, এমনকি গালমন্দ পর্যন্ত করেছেন। পরমেশ্বরের উদ্দেশে সৃজন যেমন হয়েছে তেমনই চরিত্রও হয়ে উঠেছেন পরম-ব্রহ্ম। নিরাকার ব্রহ্মের সূত্র যেমন আমরা পেয়েছি, নির্দিষ্ট দেবতাদেরও পাওয়া গেছে কবিতার গানে। গণেশ-শিব-দুর্গা-লক্ষ্মী চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কালীকে কেন্দ্র করে শ্যামা সঙ্গীতের যে ধারা গড়ে উঠেছে তেমন আর কোনও দেবতাকে নিয়ে গীতিপ্রবাহ তৈরি হয়নি। বাংলায় এই রচনাকারদের মধ্যে যেমন রথী মহারথীগণ রয়েছেন তেমনই আছেন অনামী লোককবি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা কবির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বেশ। অতীতেও যেমন ছিল তেমন আছে এখনও।

কালী পুজোর বিভিন্ন সময় ও রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী তিথি অনুসারে প্রায় প্রতি অমাবস্যায় কালীপুজো হয়ে থাকে গৃহস্থের আয়োজনে গৃহে এবং পাড়াতুতো ব্যবস্থায় কালীর থানে বা মন্দিরে। অনেক ছোট ছোট কালী মন্দির বিভিন্ন

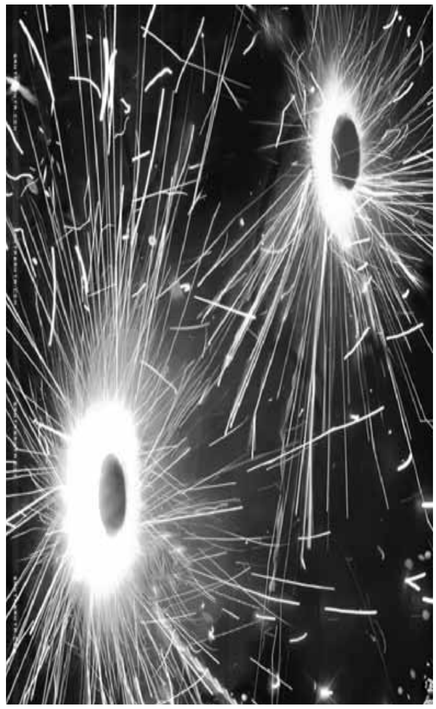

কালীপুজো কেন্দ্রিক ভাবনাও চমকে দেওয়ার মত। একবার একটি ক্লাবে কালীপুজো উপলক্ষে গড়ে তোলা হল সর্পোদ্যান। ছোট ছোট কাচের খোপে সাপ রাখা হয়েছে। কিছু নির্বিষ সাপকে ছেড়ে রাখা হয়েছে একটি ঘেরা জায়গায়। মন্ডপের কোথাও কালী প্রতিমা নেই। ছোট্ট একটি কালী মূর্তি ক্লাবের ঘরে রাখা।

এলাকায় দেখা যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা সমষ্টির আগ্রহে এই মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংস্কারের বশে। সারা বছর জল-ফুল পান দেবী, বছরে একবার হৈ চৈ করে পুজো হয়। এই মন্দিরগুলির কোনও কমিটি থাকে না। কিছু আছে অভিজাত মন্দির। ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে চলে সবকিছু। অনেক বছর পেরিয়ে এসে ভক্তের দান-ধ্যানে সেগুলি বিরাট আকার ধারণ করে। প্রতিদিন পুজো, স্থায়ী পূজারী, ভোগ-আরতি ইত্যাদি রাজকীয় আয়োজনে মানুষকে আগ্রহী করে তোলে। কোনও কোনও মন্দির পর্যটকদেরও আকৃষ্ট করে।

জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহারের সর্বজনীন কালীপুজোর বিশেষ বিশেষ ধরন আমাদের অবাক করে। কালীপুজো নয়, তাকে ঘিরে বাকি সমস্ত ব্যবস্থা মূল বিষয়। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বিশেষ 'শো' আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সেই সাবেকি পুজো এখন ধুঁকছে। বেশ কিছু বছর হল কালীপুজোর চেয়ে দীপাবলি মুখ্য হয়ে উঠেছে। অমাবস্যার রাতের যে রহস্যঘন শিহরণ তা বহু বছর অন্তর্হিত। প্রকৃতির সে অন্ধকারও নেই। আলোর রোশনাইয়ের গলা ধাক্কায় অনেকটাই দুনিয়া ছেড়ে পালিয়েছে। জোনাকিরাও হারিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। দুর্গাপুজোর থিম ভাবনার সঙ্গে কালীপুজোর 'শো'-এর কিছু তফাৎ আছে। পাহাড় প্রমাণ অর্থ কালীপুজোয় ব্যবহার হয় না। অত জমকালো ব্যাপারও নেই স্বাভাবিক ভাবেই। দুর্গাপুজোয় মন্ডপ ও অন্যান্য ভাবনার সঙ্গে প্রতিমার রূপের সম্পর্ক রাখবার প্রয়াস থাকে। দর্শনার্থীদের আগ্রহ থাকে প্রতিমা কেমন হয়েছে তা জানার। অনেক সময়ই কালীপুজোর মন্ডপে প্রতিমা কোথায় আছে তা অগণিত দর্শক জানতেও পারেন না। জানতে চান বলেও শুনিনি। দুর্গাপুজোয় যে অভিজাত গাম্ভীর্য আছে কালীপুজোয় তা নেই।

বাংলার মত আমাদের ডুয়ার্সেও অসংখ্য ছোট-বড় দীপান্বিতা কালীপুজো হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি ক্লাব এই পুজো করে থাকে। কালীপুজো কেন্দ্রিক ভাবনাও চমকে দেওয়ার মত। একবার একটি ক্লাবে কালীপুজো উপলক্ষে গড়ে তোলা হল সর্পোদ্যান। ছোট ছোট কাচের খোপে সাপ রাখা হয়েছে। কিছু নির্বিষ সাপকে ছেড়ে রাখা হয়েছে একটি ঘেরা জায়গায়। মন্ডপের কোথাও কালী প্রতিমা নেই। ছোট্ট একটি কালী মূর্তি ক্লাবের ঘরে রাখা। এক জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে মহাশ্মশান। আবহ, আলো ও মাটির পুতুলের ব্যবহারে বেশ একটা জমজমাট ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। কোথাও বা তুলে আনা হয়েছে এক টুকরো মিশর। জুরাসিক পার্ক। ওয়াটার পার্ক। গোলকধাঁধাঁ। কাচের মন্ডপ। চাল ডাল দিয়ে তৈরি প্রতিমা। হোয়াইট হাউস, কোনও বিখ্যাত মন্দির, মসজিদ, তাজমহল ইত্যাদি বিভিন্ন স্মারকের আদলে গড়ে তোলা হয় মন্ডপ। এমন আরও অজস্র ধরন।

হয় বিভিন্ন বিষয়ের শো বা প্রদর্শনী। আবহ, ভাষ্য, মাটির তৈরি পুতুল ইত্যাদি দ্বারা ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়। তাতে উঠে আসে সমসাময়িক ঘটনা। দেশ বিদেশের। না, তার সঙ্গে কালীপুজোর কোনও সম্পর্ক নেই। বিষয় হয়ে ওঠে সুনামি, কোনও বড় ভূমিকম্প, কার্গিল যুদ্ধ এমন কি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হানা। এমন আরও অনেক কিছু। আবার কোথাও অভিনীত হয় বিভিন্ন ঘটনা। বিভিন্ন নাট্যদল লোকনাট্যের শিল্পীরা এইগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। ভূতুড়ে বাড়ি, পাগলাগারদ, মহিষাসুর মর্দিনী, ডাকিনি-যোগিনী সহ কালীর তাণ্ডব নৃত্য এমন নানান নাট্যাভিনয়। এই আয়োজনে কালীর স্থান গৌণ। চারদিন ধরে দর্শক কালীপুজোকে ঘিরে এই আজব উৎসবে সামিল হয়। কোথাও কোথাও বিরাট আকারের দীর্ঘ কালীর দেখা পাওয়া যায়। একুশ হাত থেকে পঁচিশ হাত লম্বা কালী। কোথাও এমনও আছে একুশ হাত থেকে শুরু হয়ে কালীর দৈর্ঘ্য পঁচিশ হাতে পৌঁছায় এরপর ধীরে ধীরে পঁচিশ থেকে একুশে এসে আবার পঁচিশ পর্যন্ত যায়। এমন ওঠানামা চলতেই থাকে। এই কালীমূর্তিকে ঘিরেও দর্শকের প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কালীপুজোয় বাংলা ও ডুয়ার্সের বাঙালি-অবাঙালি-আদিবাসী-জনজাতি-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান সকলেই মেতে ওঠেন। যাই হোক আর আয়োজন যেভাবেই হোক সর্বজনীন উৎসব হয়ে ওঠে। জলপাইগুড়ির চার নম্বর ঘুমটির কাছে পুরনো মসজিদের পুকুর পাড়ে একটি বড় কালীপুজো এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রতিবছর হত। এখন পাশের মাঠে এই পুজোটি হয়। না কোনও ধর্মীয় কারণে পুজোটি সরাতে হয়নি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ পুকুরের জলকে পরিচ্ছন্ন রাখবেন বলে সরিয়েছেন। এমন অনেক কালীপুজোতেই অহিন্দুরা জড়িয়ে থাকেন। তবে যে নিষ্ঠা ও নিবেদিত ভাব কালীপুজোয় ছিল তা এখন আর সর্বজনীন পুজোগুলোতে দেখা যায় না। কিন্তু তাকে ঘিরে উৎসব ও আনন্দ মানুষকে কিছুদিন মাতিয়ে রাখছে তাই-ই বা কম কী!

সব্যসাচী দত্ত

বিশেষ রচনা

ভূত চতুর্দশীর রাতে তেনারা নেমে আসেন মর্তে!

এই উত্তরে, এই তরাই ডুয়ার্সে প্রকৃতির রঙিন ঝোলায় আছে আশ্চর্য যাদু! এখানে ঋতুর পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের, ঘাসের, রোদের রং পাল্টে যায়; বাতাসের গায়ে মরসুমি ঘ্রাণ থাকে লেপ্টে, জানেন তো! এ বছর আশ্বিনের শেষদিনটি ছিল দুর্গাপূজার মহানবমী; আর সেদিনটি থেকেই কেমন মন খারাপ মন খারাপ! কী তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল পুজোটা! আকাশটাও ঝামরে কাঁদল সন্ধে পেরোতেই, আর হাজার দর্শকের আনন্দের মাতন, বাহারি সাজ ভিজিয়ে ভাসিয়ে একশা করে ছাড়ল। মা দুর্গা কৈলাশে ফিরে গেলেন কার্তিকের প্রথমেই। কার্নিভ্যাল-ট্যাল সেরে, বাঁশ-প্যান্ডেল খুলতে না খুলতেই বাতাসে হাল্কা হিমের পরশ, জ্যোৎস্নার গায়ে কুয়াশার ম্যাজিক। খেতজুড়ে কিশোরী ধানচারার অপরূপ মুখচ্ছবি, আর আমাদের এই উত্তরের মানুষের প্রাণে প্রাণে বেজে ওঠে অব্যক্ত আনন্দগান। আমরা সেই ছোট্টবেলা থেকে জেনেছি আর বিশ্বাস করেছি কোজাগরী রাতে নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে সেজেগুজে প্রাণভরা আশীর্বাদ নিয়ে দুধসাদা বাহনটির পিঠে চেপে মা লক্ষ্মী ধরায় নেমে আসেন। যে ভক্ত ভক্তিযুক্ত মনে মাকে স্মরণ করবেন;
ফুলে-ফলে-পরমান্নে-আলপনায়- প্রদীপে-ধুপধুনোয় মায়ের জন্যে আসন সাজিয়ে অপেক্ষা করবেন ও আকুল হয়ে ডাকবেন মা লক্ষ্মী সেই ভক্তের ঘরে এসে দুহাত ভরে ভক্তের কাঙ্ক্ষিত সবকিছু দান করবেন। তো মা লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের মানে মর্ত্যলোকের ভক্তজনের সম্পর্ক বেশ সহজ সরল। চাওয়া-পাওয়ার নির্ভেজাল বেশ নিকট সম্পর্ক। জ্যোৎস্নামাখা ঐ কোজাগরী পূর্ণিমার রাত, মা লক্ষ্মীর লাবণ্যময় মুখ, সব মিলিয়ে বেশ ঘরোয়া অনুভব। কিন্তু তারপরেই যে পট পরিবর্তন... গৌরী থেকে কৃষ্ণা!

হ্যাঁ পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যখন একেবারে অদৃশ্য হল আর এল চতুর্দশী তিথি, সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নিশিথিনীর কথাই বলছি। ভূত চতুর্দশী তথা কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী। দীপাবলীর আগের রাত ভূত চতুর্দশীর রাত। ভূত মানে যা অতীত, যারা চলে গেছেন সেই পূর্বতন চোদ্দ পুরুষকে স্মরণ করে সারা বাড়ির কোণে কোণে চোদ্দটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার নিয়ম। ওইদিন এই জাগতিক পৃথিবীতে নেমে আসেন প্রয়াতজন; দেখে যান তাঁদের উত্তরপুরুষদের, এমনই বিশ্বাস। আমাদের গ্রামদেশে 'আকাশ প্রদীপ' জ্বালতে দেখেছি এ সময়ে এই একই কারণে। রঙিন কাগজে মোড়া বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো চতুষ্কোণ লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে লম্বা বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত। ছেলেবেলায় অন্ধকার রাতে দূর থেকে ওই আলো কেমন অলৌকিক মনে হত, ভয় ভয় করত। ভূত মানে অতীত এই সত্যের থেকেও বড় বিশ্বাস ছিল ভূত মানে ভৌতিক বিষয়, মনের গভীরে ভয়ের সঞ্চারই ঘটাত শুধু!

ওই একইদিনে খ্রিস্টানরাও পালন করেন 'হ্যালোউইন ডে'। পয়লা নভেম্বর রাতটাই হ্যালোউইন রাত। বহুকাল ধরেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালিত হয়। ষোড়শ শতকে স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে হ্যালোউইন ডে পালন করার রীতি ছিল;তখন বিচিত্র পোশাক পরে লোকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছড়া ও গান শোনাত খাবারের বিনিময়ে। একালেও খ্রিস্টানরা সমাধিস্থলে গিয়ে ফুল দিয়ে মোম জ্বালিয়ে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করে। এমন একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে ওই দিনটিতে জীবিত ও মৃত মানুষের মধ্যের সংযোগের সেতুটি উন্মুক্ত হয় আর প্রয়াতরা নেমে আসে পৃথিবীতে। তবে ইদানিং বেশ মজাদার করে জাঁকিয়ে পার্টি করার চল হয়েছে দিনটিতে। ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাতভর খানাপিনা চলে কোথাও কোথাও। প্রেতাত্মা থিমটি মাথায় রেখে বাড়ি সাজানো হয়। মাকড়সার জাল, বাদুড়ের বিরাট ছবি, লালচে আবছা আলোয় ঘর সাজানো ইত্যাদির সঙ্গে থাকবে প্রচলিত খাবার কিন্তু তাদের নাম হবে ভয়ংকর। আসলে সব কিছু থেকেই আজকের দুনিয়া মজা নিতে চায়।

সেই ছোট্টবেলা থেকে দীপাবলীর আগের দিনটিকে জানতাম চোদ্দপ্রদীপ জ্বালানো, চোদ্দশাক খাওয়া এমন সব নিয়মের দিন হিসেবে। এখনও শহরের বাজারেও সবজি বিক্রেতারা আঁটিবাঁধা চোদ্দশাক বিক্রি করেন।

যাইহোক সেই ছোট্টবেলা থেকে দীপাবলীর আগের দিনটিকে জানতাম চোদ্দপ্রদীপ জ্বালানো, চোদ্দশাক খাওয়া এমন সব নিয়মের দিন হিসেবে। এখনও শহরের বাজারেও সবজি বিক্রেতারা আঁটিবাঁধা চোদ্দশাক বিক্রি করেন। মহালয়ার আগেই একবার ঘরবাড়ি ধোয়ামোছা, কাচাকাচি হয়ে গেছে সব বাড়িতেই। আবার কালীপূজার আগের রাত ওই কৃষ্ণচতুর্দশী তিথি তথা সাদা বাংলায় চোদ্দবাতির দিনেও বাড়িঘর উঠোন বাগান সবই হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর আগের হাট থেকে কিনে আনা মাটির প্রদীপগুলো জলে বেশ খানিক সময় ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে মুছে তুলসী তলায় উপুড় করে রাখা হল; সারা দুপুরজুড়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুমার সঙ্গে আমরা নাতি নাতনিরা পুরনো ধোয়া সাদাকাপড়ের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ পলতে পাকাতাম। সে পলতে চুবিয়ে রাখা হল বাটি ভরা সরষের তেলে। তখন আমাদের গ্রামদেশে আজকের মতো দোকানে রেডিমেড পলতে বিক্রির চল হয়নি।

তো শেষ বিকেলের আলোটুকু ফুরিয়ে গিয়ে যখন আকাশে ফুটে উঠলা দু-একটা তারা আর শাঁখে পড়ল ফুঁ, তখন চোদ্দপুরুষের উদ্দেশে বাতি বা প্রদীপ জ্বালানোর সময়। আর সে প্রদীপগুলো একটা থালায় সাজিয়ে জ্বালিয়ে নেওয়া হল। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত বাবা। প্রণাম করলেন বাকিরা সবাই, তাঁদের দেখে দেখে আমরাও শিখেছিলাম সেই রীতি। জেনেছিলাম প্রদীপগুলো জ্বালানো হচ্ছে আমাদের বংশের প্রয়াত সব আত্মীয়দের উদ্দেশে। তাঁদের জন্যে কালীপূজার আগের এই চতুর্দশীর রাতে ভক্তিভরে আলো জ্বালতে হয়। ওই আলোয় পথ চিনে চিনে প্রয়াতজনেরা পৃথিবীতে আসেন পরিবার পরিজনদের দেখে যান। খুশিমনে আশীর্বাদ করে আবার স্বর্গলোকে ফিরে যান।

সেদিন চোদ্দশাক খাওয়ার নিয়ম ছিল বাড়িতে। এত প্রকার শাক তো আর গ্রামের হাটে পাওয়া যেত না, সুতরাং ঠাকুরদার নেতৃত্বে আমাদের ছোটদের একটি দল সারাটা গ্রামের পথে ঘাটে মানে হিন্দিতে যাকে বলে 'কোনা কোনা ছান মারা' সেরকম ছান মেরে বা খুঁজে খুঁজে শাক কুড়োতাম। দুপুরে ভাতের থালায় চোদ্দ শাক মাস্ট। এ সবই বিগত চোদ্দপুরুষের উদ্দেশে

পালনীয় রীতি। আর যারা মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে চতুর্দশীর রাতে আলো জ্বালে না, সেই পরিবারের ক্ষতি হয়, কেননা মৃত্যুর পর আত্মীয়রা তাঁদের ভুলে গেছেন ভেবে সেইসব আত্মারা কষ্ট পান এবং ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপও দিতে পারেন। এসব কথা বলত আমাদের এক পিসি, বেশ ভয় ধরানো বার্তা দিত সে। ফ্ল্যাটবাড়ির যুগ আসতে তখনও মেলা দেরি। আমাদের গ্রামদেশের সেই ছড়ানো বাড়ির শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর সব দুয়োরে দুয়োরে আবার কুয়োতলায়, সামনের বাগানে, পেছনের সুপুরি বাগানে সব খানেই প্রদীপ দিয়ে আসতে হত। কয়েকটি করে জ্বালানো প্রদীপ হাতের থালায় সাজিয়ে ঠাকুমা বলে দিতেন, 'এইবার গোয়াল ঘরে আর রান্নাঘরের দুয়ারে বাতি রাইখা আসো।' পর্যায়ক্রমে বাতি দিয়ে আসতাম আমি ধোয়া পোশাকে, দাদা কিংবা ভাই নয়! সে বাড়ির কন্যেটিকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। এতে বেশ গর্ব ভাব জাগত মনে। একা ওই পেছনের বাগান বা ধানখেতে যেতে ভয় করলেও কাউকে বলিনি সে ভয়ের কথা। গুরুত্ব হ্রাস পাবে ভেবেই হয়ত বা। তা সে যা হোক, এখন ভাবি সত্যি সে বাড়িতে কন্যাসন্তানের গুরুত্ব কিছু কম ছিল না!

ওই সুপুরি বাগান পেরিয়ে খানিকটা নাবাল, সেখানেই ফসলের জমি শুরু। বহুদূর সেই বাসরাস্তা অব্দি বিস্তারিত। একটি প্রদীপ দিতে হত সেখানেও; এ বয়সে এসেও সেই নাবাল জমিতে একা একা গিয়ে প্রদীপ দিয়ে আসবার সময়কার কেমন এক শিরিশিরে ভয়ের অনুভূতি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে টের পাই। আকাশের অজস্র নক্ষত্রের গা থেকে ওই অন্ধকার রাতেও কেমন এক আলো নেমে আসত সামনের বিস্তারিত হাল্কা কুয়াশামাখা ফসলের খেতের ওপর। সত্যি কি ওঁরা আমায় দেখছেন, আকাশের তারাগুলোর মধ্য থেকে! আমি যাদের চিনি না, নাম জানি না কিন্তু অনেকদিন আগে পৃথিবী ছেড়ে বাড়ি ঘর সব ছেড়ে চলে যাওয়া আমাদের আত্মীয়রা! সত্যি কি আমায় ওঁরা চেনেন? আমার নাম জানেন?

এ বয়সে এসেও সেই নাবাল জমিতে একা একা গিয়ে প্রদীপ দিয়ে আসবার সময়কার কেমন এক শিরিশিরে ভয়ের অনুভূতি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে টের পাই। আকাশের অজস্র নক্ষত্রের গা থেকে ওই অন্ধকার রাতেও কেমন এক আলো নেমে আসত সামনের বিস্তারিত হাল্কা কুয়াশামাখা ফসলের খেতের ওপর। সত্যি কি ওঁরা আমায় দেখছেন, আকাশের তারাগুলোর মধ্য থেকে!

আজ আমার নিকট জন, যাদের স্নেহ ছায়ায় কেটেছে বাল্য, কৈশোরের আলোময় দিনগুলো তারাও অনেকেই তো তারার দেশে। সে ছড়ানো উঠোন বাড়ির চেহারা পাল্টেছে। যাওয়া হয় ক্বচিৎ। তবে জেলা শহরের ছোট বাড়িতে চোদ্দপুরুষের উদ্দেশে চোদ্দটি প্রদীপ জ্বালি প্রতিবছর। স্পষ্ট ভেসে ওঠে সেইসব প্রিয়মুখ মনের আয়নায়। আর শুধু আমি কেন, ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই আশেপাশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই চোদ্দবাতি জ্বলছে, পূর্বপুরুষদের স্মরণে। হাল্কা শীতের হাওয়ায় প্রদীপের শিখা কাঁপে, বারবার অল্প করে তেল ঢালি প্রদীপের বুকে। মনে মনে চাই অনেক রাত অব্দি জ্বলুক চোদ্দপুরুষের উদ্দেশে দেওয়া বাতিগুলো। নেমে আসুন ওনারা, আশীর্বাদ করে যান আমাদের।

পূজিত হবেন অমাবস্যার অন্ধকারের মতোই ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দেবী মহাকালী। কী ভয়ংকর তাঁর রূপ! শক্তি-উপাসকেরা তাঁকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। নরমুণ্ড মালায় ভূষিতা, করাল বদনা, কৃষ্ণবর্ণা, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ এই দেবীর পদতলে মহাকালরূপী শিব। অসুর বা অশুভ শক্তির বিনাশক মহাকালী। গভীর রাতে তাঁর পুজো। প্রকৃত ভক্তজন মায়ের এই ভয়ংকর রূপের মধ্যেও খুঁজে পান বরাভয়! অস্ত্রসজ্জিতা দেবী পূজিতা হন মহামাতৃকা রূপে।

সন্ধে বেলায় দীপাবলীর আলোয় সাজে শহর, সাজে গ্রাম। বাল্যকালে তখন কলাগাছ, মাটির প্রদীপ,পলতে। শশব্যস্ত আমরা প্রতিটি কাজে। বাঁশের বাতা দুধারের কলাগাছে বিঁধিয়ে রাখা, তাতে মাটি গুলে ছোট ছোট ঢেলা বসানো তার ওপর প্রদীপ বসানো, কাঠি দিয়ে প্রদীপের পলতে বাড়ানো প্রয়োজনে তার বুকে তেল ঢালা, কত্তো কত্তো কাজ! কয়েকটা তারাবাতি বরাদ্দ, ভাইবোনেদের মধ্যে ভাগ করে করে তবু প্রাণে এত খুশির ঢেউ! তারাবাতির ওই ছড়িয়ে পড়া আলোর ফুলকির মতো প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা! আকাশেও কোটি নক্ষত্রের ঝকমকে চাঁদোয়া। রাতের বেলায় অন্যরকম মেনু, ভাতের পরিবর্তে ছোলার ডাল, লুচি, মাংস। ঠাকুমা দাদু বাবা কাকাদের মুখে শুনে শুনে বড় হয়েছি তাদের দ্যাশের বাড়ির কালীপূজার গল্প। সে পুজোয় বলি হত।

আমাদের বাড়ি থেকে মাঝরাতের পুজোয় বারোয়ারি মন্ডপে যাওয়ার বিষয়ে কঠিন নিষেধ ছিল ছোটবেলায়। তবে তাতে তেমন দুঃখ বোধ ছিল এমনটা নয়। বাড়িতেই মহা আনন্দে কাটত কালীপূজার রাত। আর সত্যি বলতে নানা মিথ শুনে শুনে বা এই রক্তপাত বা বলি বা কালীঠাকুরের ওই ভয়ংকর মূর্তি তেমন কাছে টানতো না। সময় দ্রুতগামী, তার পিঠে চেপে চলে এসেছে বাজারে বিবিধ বর্ণময় আলো। চিনদেশ থেকেও নাকি আমদানি হরেক কিসিমের আলোর মালা। এখন আর ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনও মওকা নেই। তেল লাগে না, হাওয়ায় নেভে না। কন্ট্রাক্ট দিলে লোকেরা এসে সময় মত বাড়ি বাড়ি আলোর মালা ঝুলিয়ে দিয়ে যাবেন। সারারাত ঘুরে ঘুরে শহর থেকে শহরান্তরে গিয়ে মন্ডপ সজ্জা দেখার চল, আর আছে ধনতেরাসের কেনাকাটা। গয়না নাকি কিনতেই হয়! নানা নেশার আসর, বাজি-পটকা বিপুল আনন্দের বাজার বটে। ব্যবসা বাণিজ্য হয় বটে। তাতে করে হৃদকমলে জবা ফোটে কিনা, মনের আঁধার সরে গিয়ে প্রকৃত আনন্দ আলো জ্বলে ওঠে কিনা সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না আপাতত।

তনুশ্রী পাল

দেবীর অলংকার সজ্জায় কালিয়াগঞ্জের বুলন ও শোলা শিল্পীরা মুনাফা প্রত্যাশা করেন না !

প্রতিবেশি পি এনপিসি

শোলার অলংকার তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী

শাস্ত্রে বলে শিবের কঠোর আরাধনায় ব্রতী হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করে অসামান্য ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারি হয়েছিলেন কুবের। লক্ষ্মীদেবীর মতই ধনসম্পত্তির রক্ষাকারী হিসেবে পুজিত হন ধনকুবের। দেবী দুর্গাকেও অলংকারে সাজিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তবে বাঙালীর এই পুজোর মরসুমে দুর্গাপ্রতিমা, লক্ষ্মীপ্রতিমা ও কালীপ্রতিমাকে অলংকারে সাজিয়ে তুলতে দিনরাত কাজ করে চলেছেন উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের দক্ষিণ আখানগর এলাকার বুলন শিল্পীরা। ধনকুবেরের মত এদের নেই আর্থিক সামর্থ, ঘরে নিত্য অভাব। তবু সারা বছর ধরে কাজ করে পুজোর মরসুমে দু'পয়সা রোজগারের আশায় দেবীকে অলংকারে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব এরা তুলে নেন নিজেদের কাঁধে। প্রতিমা, মন্ডপ নির্মান বা আলোক সজ্জা যতই মন কারুক দেবী অলঙ্কার আরও আকর্ষণীয় করে তোলে পুজোর আবহকে। মালাকার শিল্পীদের হাতে তৈরি জমকালো বুলন সেটের সাজে দেবীর উজ্জ্বলতা যেন বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। পুজোর দিনগুলিতেও এই শিল্পীদের পরিবার ব্যস্ত থাকে এই অলংকার নির্মানে।

উৎসব প্রিয় বাঙালী যখন মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে দেবীর চোখ ধাঁধানো অলংকারে মোহিত হয়, তখন এই অলঙ্কারের পেছনে এই শিল্পীদের অনটনের করুণ ছবিটা হয়ত জানতেই পারে না কেউ। বর্তমান অগ্নিমূল্যের যুগে অলংকার তৈরি করে প্রাপ্য লাভটুকুও হাতে আসে না বলে জানালেন শিল্পী সুনীল মালাকার। এছাড়াও নানা ধরনের অলংকার বাজারে আসাতে বুলন শিল্পীদের কাজের স্বীকৃতি বিভাজিত হয়ে পড়ছে। তাদের বাপ ঠাকুরদার পেশা এই মালাকার শিল্প, সারা বছর নানা ধরনের কাজ করলেও এই সময়টাতে নানাধরনের বুলন সেটের কাজ করেন তারা। দুর্গা পূজার সময় চাহিদাটা বেশি থাকে, এরপর লক্ষ্মী পুজো ও কালি পুজোতেও কাজের ব্যস্ততা থাকে। তাদের হাতের তৈরী বুলন সেট অলঙ্কার গুলি পাশের রাজ্য বিহার থেকে শুরু করে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যায়। সুনীলবাবু জানান, চুমকি, জড়ি, পিচবোর্ড, আঠা, পুঁতি দিয়ে রংবেরংয়ের চোখ ধাঁধানো এই অলংকার তৈরি করতে যে ধরনের পরিশ্রম করতে হয় তাদের সেই পরিমাণ অর্থ নেই। তবু এই কাজকে ভালোবেসে অলংকার তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। দেব দেবী কে নতুন অলংকার সাজিয়ে তুললেও পুজোতে তাদের কপালে জোটে না নতুন বস্ত্র।

রায় কলোনি এলাকার শোলা শিল্পী শ্যামল রায় ও তার পরিবারেরও পুজোর মরসুমে নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না। পরিবারে নিত্য অভাব। কিন্তু তাতে কী! মন দিয়ে সপরিবারে সনাতনী এই শোলার অলঙ্কারে দেবী প্রতিমাকে সাজাতে রাতদিন এক করে কাজ করা। জাঁকজমক যতই থাকুক শোলার অলংকারে সুসজ্জিতা দেবীর রূপ সবচাইতে মোহময়ী। তাই আজও প্রাসঙ্গিক শোলার তৈরি এই গয়না। বুলন শিল্পীদের মতই রায় পরিবারের পূর্বপুরুষরাও শোলার অলংকারের এই কাজ করে আসছেন। এইসব অলংকার তৈরি হয় জলাজমিতে নেহাতই অবহেলায় জন্মানো শোলা গাছের কান্ড শুকিয়ে। এরপর এই শোলা কেটে নানান ডিজাইনের অলংকার তৈরি হয় দেবীর জন্য। জেলার ইটাহার ব্লক থেকে শোলাগুলি নিয়ে আসা হয়। এরপর অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয় নানা ধরনের অলঙ্কার। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য থার্মোকলও ব্যবহৃত হয়। শ্বেতশুভ্র অলংকারে দেবী মূর্তির শোভা নজর কাড়ে পুজো দেখতে আসা অসংখ্য মানুষের। শোলার তৈরি এই নিখুঁত অলংকার শুধু উত্তর দিনাজপুর জেলা নয় পার্শ্ববর্তী জেলা এমনকী বিহারেও পাড়ি দেয়। শোলার অলংকারে কিছু লাভও থাকে হাতে। পুজোতে শুধু পরিবার নয় বাইরের থেকেও লোক রাখা হয় বরাত পাওয়া কাজ চটজলদি শেষ করতে।

এত পরিশ্রম আর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ থাকলেও এই শিল্পী পরিবারেরই কারোরই জোটেনি শিল্পী পরিচয়পত্র। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের আওতায় কিছু ঋণ মেলায় এখনও পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। কাঁচা মালের দাম বেড়েছে, পাশাপাশি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন দেওয়া, সব মিলিয়ে লাভ নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও পুজোর মরসুমে শিল্পীমনের আবেগকে সঙ্গী করে দেবীর অলংকার তৈরিতে বেজায় ব্যস্ত বুলন সেট ও শোলা শিল্পীরা। শুধু বড়রাই নয়, এই শিল্পের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে শিল্পীদের নতুন প্রজন্মও। কিন্তু সরকারি সাহায্য না পেলে কতদিন এভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন তারা তা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে এই শিল্পীদের কপালে। তবু নিজেকে শুধুই এক অলংকার শিল্পী ভেবে দেবদেবীদের সাজিয়ে চলেছেন এরা। আশা একদিন হয়ত দেবতা প্রসন্ন হবেন। আর দীপাবলির মত আশার আলোয় ভরে উঠবে এদের জীবন।

এত পরিশ্রম আর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ থাকলেও এই শিল্পী পরিবারেরই কারোরই জোটেনি শিল্পী পরিচয়পত্র। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের আওতায় কিছু ঋণ মেলায় এখনও পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। কাঁচা মালের দাম বেড়েছে, পাশাপাশি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন দেওয়া, সব মিলিয়ে লাভ নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও পুজোর মরসুমে শিল্পীমনের আবেগকে সঙ্গী করে দেবীর অলংকার তৈরিতে বেজায় ব্যস্ত বুলন সেট ও শোলা শিল্পীরা। শুধু বড়রাই নয়, এই শিল্পের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে শিল্পীদের নতুন প্রজন্মও।

অপরাজিতা জোয়ারদার

ও মহানন্দা তুমি বইছ কেন ?

ভোর হচ্ছে। গাঢ় থেকে তরল হচ্ছে অন্ধকার। নদীর জলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ভোরের আলো। স্নিগ্ধ হচ্ছে জল। গড়িয়ে যাচ্ছে এক মহতের সঙ্গে মিশে যেতে। স্বচ্ছ এই ধারা গড়িয়ে এসেছে কোনও এক মৌন-মহানের অভ্যন্তর থেকে, দুইপাশে জনপদ গড়তে গড়তে তার বয়েচলা। বয়ে চলাতেই তার আনন্দ। থামে না সে, আসলে থামতে জানে না কোনও নদী ।

শহর শিলিগুড়ির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা নদী। মৌন-মহান হিমালয়ের শাখা-পর্বত মহলদীরাম পাহাড়ের পাগলাঝোরা থেকে এর উৎপত্তি। মহানন্দা অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে অনায়াস পথ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে আপন খেয়ালে। তীরে গড়ে উঠেছে শহর শিলিগুড়ি। মেচি, কঙ্কাই, বালাসন, কালিন্দির জল বুকে নিয়ে একসময় লীন হয়েছে গঙ্গায়।

একটি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী হয়ে ওঠে সেই শহরের প্রাণ, শহরের সৌন্দর্যায়নের অন্যতম অঙ্গ। অথচ স্বচ্ছ জলে ভয়ংকর ছায়া। মানুষের অসচেতনতা লোভ নদীর জলকে দূষিত করে চলেছে। শিলিগুড়ি শহরের প্রধান নদীতে কাঠামো জমে থাকে। আবর্জনা জমে থাকে নদীর চরে। বার্ষিক উৎসব শেষে হয়ত পরিষ্কৃত হবে নদীর ঘাট। কারণ এরপরই আছে ছট পুজো। তখন অবশ্য ঘাট দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা নদী কি না!

একটি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী হয়ে ওঠে সেই শহরের প্রাণ, শহরের সৌন্দর্যায়নের অন্যতম অঙ্গ। অথচ স্বচ্ছ জলে ভয়ংকর ছায়া। মানুষের অসচেতনতা লোভ নদীর জলকে দূষিত করে চলেছে। হৈ হৈ করে শেষ হল শহুরে পুজো। দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দে, এতোল-বেতোল নাচে, বাজি ফাটিয়ে শোভাযাত্রা করে সব প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হল লালমোহন মৌলিক ঘাটে আর ‘পুনরাগমনায় চ’ বলে ফেলে দেওয়া হলো জলে। ওইটুকু জল তাতে শত শত প্রতিমা। কখন তারা পঞ্চভূতে বিলীন হবে কে জানে!

শিলিগুড়ি শহরের প্রধান নদীতে কাঠামো জমে থাকে। আবর্জনা জমে থাকে নদীর চরে। বার্ষিক উৎসব শেষে হয়ত পরিষ্কৃত হবে নদীর ঘাট। কারণ এরপরই আছে ছট পুজো। তখন অবশ্য ঘাট দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা নদী কি না! কিন্তু যেই ভোর হয়ে আসে তখনি ওঁ জবাকুসুমসংকাশ মন্ত্রে শয়ে শয়ে লোক নেমে আসে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য দিতে। একবার সরস্বতীপুজোয় আগের বছরের প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে গা-ঘিন ঘিন করে উঠেছিল। পাড়ে শুকনো বিষ্ঠার ছড়াছড়ি। তারই সঙ্গে বিড়াল ও কুকুরের মৃতদেহ। কোথায় পা রাখি এমন অবস্থা!

এখানেই তো শেষ নয়। এসব তো নিরীহ যাপন। ছোট ছোট নীচু এলাকায় বালি-মাটি-ঘেঁস ফেলে মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে তৈরি হওয়া প্লট রাতারাতি হাতবদল হচ্ছে। নদী বিক্রি হচ্ছে।

মহানন্দা নদীর ওপর আলোক সজ্জিত তিনটি ব্রিজ, নীচে অন্ধকার খাটাল— আবহমান। ক্রিমেটোরিয়ামের ছাইও না কি ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদীতে! শহরের আশপাশে রয়েছে বালাসন, সাহু। কম-বেশি একই অবস্থা নিয়ে ধুঁকছে তারাও। আর শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরী তো একটি বড়সড় ড্রেন। মশা-মাছি আর যাবতীয় রোগের আতুড়ঘর।

অথচ প্রতিটি নদী শোনাতে পারতো টুং টাং জলতরঙ্গের ধ্বনি। প্রতিটি নদীর প্রবাহ গান হয়ে উঠতেই পারত সবাই চেতনা হারিয়ে না ফেললে! পরিবেশপ্রেমী মানুষ আর সরকারি আধিকারিকেরা সমান আন্তরিক হলে! কলকল্লোলে প্রাণিত হত শহরের সন্ধ্যা ও ভোর। হারিয়ে যাওয়ার আগে লক্ষ বিষ ও বেদনা নিয়ে তবু বয়ে চলে তারা।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

বইপত্র সাহিত্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য জুড়ে উত্তরবঙ্গ

বেশিরভাগ মানুষই জানে তিনি টেনিদার স্রষ্টা, কিন্তু তার বাইরেও যে তাঁর রচিত সাহিত্যের একটি বিরাট বিস্তারিত জায়গা আছে, তা আর ক'জন মনে রেখেছে? উত্তরবঙ্গ জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সের সঙ্গে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল অপরিমেয় সখ্য, গভীর আত্মীয়তা, এই অংশটুকুতে আলো ফেলবার জন্যই নভেম্বরের ৬ তারিখ তাঁর প্রয়াণ দিবসে এই স্মরণ-বিস্মরণ।

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য জীবনী নেই, কিন্তু তাঁর রচনাবলী খুলে দেয় তাঁর জীবন ও সাহিত্যের বন্ধ দরজা জানালাগুলি। এই খোলা দরজা জানালা থেকে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহর, গ্রাম, অরণ্য প্রকৃতি, চা-বাগান, নদনদী আর নানা রকমের মানুষজন। ডুয়ার্সের চা-বাগান আর বনভূমির সঙ্গে তাঁর ভালবাসা জন্মেছিল জলপাইগুড়িতে এসে। ১৯৪২-এ জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের একেবারে প্রতিষ্ঠা লগ্নে অধ্যাপনা সূত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জলপাইগুড়ি আগমন। রেসকোর্স পাড়ায় কলেজের অস্থায়ী ভবন। ছাত্র সংখ্যা একানব্বই। অবৈতনিক অধ্যাপক ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ কল্যাণভূষণ চক্রবর্তীরা শুরুতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন; পরে আরও অনেকে এলেন। কবি বেনু দত্ত রায় তাঁর আত্মস্মৃতিতে প্রিয় অধ্যাপকের ছবি এঁকেছেন— 'এ কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন সুবিখ্যাত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ...ফর্সা লম্বা, খাড়া তরবারীর মত চেহারা, ধারালো ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী— মানুষটি ছিলেন সে সময় আমার ও আমার মত অনেকের চোখেই ঈশ্বর প্রতিম পুরুষ। খুব সিগারেট খেতেন, অমায়িক মানুষ, রাস্তায় কোনও কোনও দিন দূর থেকে হেঁটে আসতে দেখতাম, যৌবনের দেবদূতের মত।' দু'বছরের বেশি কিছু সময় তিনি আনন্দচন্দ্র কলেজে ছিলেন। এরপর চলে যান কলকাতার সিটি কলেজে, তারপর আমৃত্যু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জলপাইগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নারায়ণবাবুর কখনও ছিন্ন হয়নি। এই শহরের বিখ্যাত আইনজীবি ভগবানচন্দ্র সান্যালের কন্যা আশা দেবীকে তিনি বিয়ে করেন। কলকাতা থেকে প্রায়ই আসতেন, ডুয়ার্সের চা-বাগান জঙ্গলে বেড়াতে ভালবাসতেন। ১৯৬৮তে জলপাইগুড়িতে যে বিধ্বংসী বন্যা হয় তাতে তার প্রিয় শহর ও শহরের মানুষজনের ক্ষতি ও দুর্ভোগের জন্য নারায়ণবাবুর চিন্তা ও ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে সেই ব্যাকুলতার কথা উদ্ধৃত করছি— 'তিন বছর আগে জলপাইগুড়ির বন্যার পর ওকে আর এক ভূমিকায় দেখেছিলাম। উত্তরবঙ্গে বন্যার পর কলকাতার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা করে কিছু সাহায্য ও জামাকাপড় সংগ্রহ করার প্রস্তাব উঠেছিল। শ্যামবাজার থেকে শোভাযাত্রা বেরনোর কথা, গিয়ে দেখি বিশেষ কেউ আসেনি, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আশা দেবী ঠিক উপস্থিত।... সেদিন প্রচণ্ড রোদের মধ্যেই ঘণ্টা চারেক পায়ে হেঁটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একাধারে জনপ্রিয় অধ্যাপক, কবি, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্র নাট্যকার, জার্নাল লেখক। এই সবকিছুর মধ্যে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে উত্তরবঙ্গ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় লিখেছিলেন তারাশঙ্করের যেমন রাঢ় অঞ্চল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তেমন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং— আর রাজশাহি দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা ছিল অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গ, আজ তা বিভক্ত দুটো দেশে। দেশ ভাগের যন্ত্রণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনেও প্রগাঢ় ছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি তো জলপাইগুড়িতে বসেই লেখা। এই উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন, আনন্দচন্দ্র কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক প্রিয় বন্ধু বীরেন্দ্র লাল লাহিড়ীকে। তাঁর 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা', 'লাল মাটি' জুড়ে আছে বরেন্দ্র ভূমি তথা প্রাচীন উত্তরবঙ্গের গন্ধ। গৌড়, মহানন্দা নদী, অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপাল, কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্যক, এসব তো উত্তরবঙ্গের আপন কথা। 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসের 'নিশ্চিন্ত নগর' সেকি বালুরঘাট না জলপাইগুড়ি? 'সূর্যসারথী' উপন্যাসের প্রসঙ্গে আশা দেবী সাহিত্যিক স্বামী সম্পর্কে লিখছেন— 'বেড়াতে ভালো বাসতেন হিমালয়ের তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলে'। আর 'টোপ', 'বনজ্যোৎস্না', 'বনতুলসী', 'কালো জল' এর মত গল্পগুলি, যা স্মরণীয় করে রেখেছে ডুয়ার্সের অরণ্য প্রকৃতি-চা বাগান— সুন্দর কোমল আর রুক্ষ ভয়ঙ্কর মানুষজনকে।

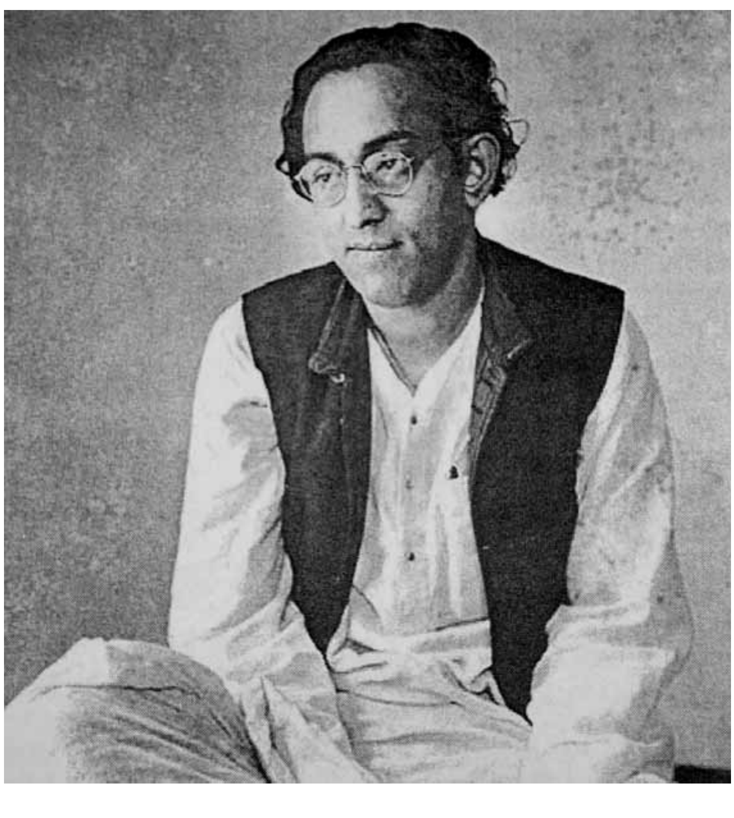

উত্তরবঙ্গকে নিয়ে লিখে যে সব কথাসাহিত্যিকরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের কেউ কিন্তু তেমন করে এই পূর্বজকে স্মরণ করেননি। শতবর্ষ বা শতবর্ষ অতিক্রান্ত সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করবার একটা উপলক্ষ্য তো বটেই। উত্তরবঙ্গ নিয়ে লিখতে হলে এই পূর্বজ'র সাহিত্য সন্ধান তো করতেই হবে।

রণজিৎ কুমার মিত্র

পাঠকের কলমে

বেনারসে রাজ ঐতিহ্য মণ্ডিত কোচবিহার কালীবাড়ির ভগ্নদশা আমাদের লজ্জিত করে না ?

ঠিকানা সোনারপুরা, বাঙালি টোলা হাই স্কুলের নিকটে, বারাণসী। অটোওয়ালাকে বলতেই পৌঁছে গেলাম অল্প সময়েই। গেটে দারোয়ান ভাগিয়ে দেওয়ার মৃদু চেষ্টা করলেও, সেই কোচবিহার থেকে দেবী দর্শনে এসেছি শুনে ঢুকতে দিল। সামনে বড়সড় ঘাসের লন পেরিয়ে গেস্ট হাউস। পাশে কালীবাড়ি। সামনের বিস্তৃত বাগান দীর্ঘ অবহেলায় ঝোপে পরিণত। ছবি তুলতে দেখে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ, আপনি কি পত্রকার? নেহাতই টুরিস্ট শুনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন? নাকি হাফ ছাড়লেন? এদিক ওদিক ভেঙ্গে পড়া কড়ি বরগা, নোনা ধরা দেওয়াল, খসে পড়া চুন সুড়কি দেখাতে দেখাতে কালীবাড়ির সেই পূজারি বা কেয়ারটেকার ঝা-জি জানালেন, গত পঞ্চান্ন বছর এখানে আছেন, কালীবাড়ির করুণ পরিস্থিতি চোখে দেখা যায় না! আট ন'টি বড় বড় বাড়ির সব ক'টিই ভেঙ্গে পড়বার মুখে, পুরনো বহু ভাড়াটে আছে যাদের কাউকেই হঠানো যাচ্ছে না। এরপর তিনি অদৃশ্য হলেন। দেখা মিলল বাঙালি টোলার এক আটপৌরে সাজের ভদ্রমহিলার সঙ্গে, বাড়ি খুব কাছেই, উনি রোজ আসেন। বললেন, বহুদিন যাবৎ সংস্কার ও মেরামতির অভাবে কালীবাড়ির এমন হতশ্রী দশা। বাড়ির এক কোণে মা তারার মন্দিরেও নিয়ে গেলেন, বললেন বড়ই জাগ্রত এই দেবী। সর্বত্র মলিনতার ছাপ। এবারও দুর্গা পূজা হয়েছে। আর গেস্ট হাউসও নাকি লজ হিসেবে ও বিবাহ অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়! ভাড়াও নাকি চড়া! কিন্তু কে নেয় এই টাকা? তা জানা নেই ওঁর।

যেমন আমাদের মত আম কোচবিহারবাসীর জানা নেই এই কালীবাড়ির ইতিহাস বা ঠিকুজি, কেন এই ভগ্নদশা, বা এ নিয়ে কোথাও কোনও হেলদোল হচ্ছে কি না! কেবল এইটুকু জানি, এই কালীবাড়ি আমাদের কোচবিহার তথা বাংলার যথেষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্পদ, এর মালিকানা কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্টের হাতে, এবং দৃশ্যত তা ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছে। কোচবিহারের মানুষকে এইটুকুই কি লজ্জায় ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কোচবিহারের মাননীয় জনপ্রতিনিধিদের এবং দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে কি অনুরোধ করতে পারি কোচবিহার কালীবাড়ির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে শীঘ্রই উদ্যোগী হওয়া সম্ভব কি না একটু খতিয়ে দেখতে?

বহ্নিলেখা তালুকদার

ডুয়ার্সের চা বাগান চেনার প্রথম পর্যায় শেষে ফিরে দেখা আরেকবার

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগত। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না সেই জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে বা ডুয়ার্সের নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা সাম্রাজ্যের ভুগোল সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। ২০১৭-র নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছিল চরৈবেতি। চলতে চলতে কখন যে জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ, মেটেলি এবং মালবাজার ব্লকের প্রত্যেকটি চা বাগানে সমীক্ষা করে ফেলেছি তা নিজেই বুঝতে পারিনি। একদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ বাগিচাক্ষেত্র, উত্তরের অসাধারণ হিমালয় পর্বতমালা, অনাবিল সারল্য নিয়ে বাগিচার আদিবাসি ও নেপালি বাগিচা শ্রমিকদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম এবং সামগ্রিকভাবে চা বাগিচাগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিকাঠামোগত দিক তুলে আনবার চেষ্টা করেছি এই কলামে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের চারটি, রাজগঞ্জ ব্লকের দুটি, মেটেলি ব্লকের ১২টি এবং মালবাজার ব্লকের ২২টি চা বাগিচা সফর শেষে এবার শুরু হবে বানারহাট, নাগরাকাটা, ধুপগুড়ি, বিন্নাগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলের বাগিচাগুলির সমীক্ষা। পাশাপাশি লাটাগুড়িকে কেন্দ্র করে ক্রান্তির হাট এবং রামসাইয়ের যাদবপুর চা বাগিচার কাজও বাকি আছে।

মেটেলি বা মালবাজার ব্লকের চা বাগিচাগুলির পরিকাঠামোগত দিক এবং পর্যটন সম্ভাবনার আঙ্গিক নিয়েই আলোচনার পরিসর সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু এই পর্বে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির পরিকাঠামোর দিকগুলো তুলে ধরবার পাশাপাশি চা বাগিচার জনজীবনের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলিকেও তুলে ধরার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বাগানগুলি সমীক্ষা করতে গিয়ে কোন কোন সময় ওঁরাও পরিবারে রাত্রিযাপন করে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাদের সমাজ জীবন সম্পর্কে যেমন জেনেছি, তেমনি ডুয়ার্সের আদিবাসীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন কেমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তারও স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছি। পাশাপাশি জনকল্যাণের নামে খ্রিষ্টধর্মের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ার সর্বনাশা দিকগুলিও পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা উপলব্ধি করেছি। তাই ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিমুখটিকে একটু পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে।

শুরু করেছিলাম কৈলাসপুর চা বাগিচা দিয়ে। ডানকানসের বাগরাকোট, কিলকট, নাগেশ্বরী ছাড়াও সামসিং, রায়পুর, জয়পুর, শিকারপুর, ভান্ডারপুর, মানাবাড়ি, সোনালী, কুমলাই, তুনবাড়ি বাগানের ভয়ঙ্করতম শ্রমিক শোষণ এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার সংকট লক্ষ্য করেছি। অন্যদিকে সোনগাছি, আইভিল, চালশা, চিলৌনি, এঙ্গো, জুরান্তি, মেটেলি, লিজ রিভার, পাথরঝোরা, ওদলাবাড়ি, ডেঙ্গুয়াঝাড়, ডামডিম, করলাভ্যালি, রাঙ্গামাটি ইত্যাদি বাগিচাগুলির মত সুনাম অর্জনকারী বাগিচাগুলিতেও ঘুরে দেখেছি। বিস্তারিত সমীক্ষা করে দেখেছি ভান্ডিগুড়ি, সরস্বতীপুর, কৈলাসপুর, আনন্দপুর, যোগেশচন্দ্র, নেপুচাপুর, সাইলি, রানীচেরা, গুরজংঝোরার মত সমস্যাদীর্ণ চা বাগিচা ক্ষেত্রগুলি, সুনাম বজায় রেখে টিকে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

ঘন সবুজ বন আর নীল পাহাড়কে সঙ্গী করে ওদলাবাড়ি থেকে মানাবাড়ি। সেই আদ্যিকালের কাঠের ঘর বাড়ি। দু চার পা এগোলে চারিদিকে সবুজ সমুদ্র। যেদিকেই দৃষ্টি ফেরানো যায় শুধুই চা বাগান। যেহেতু অফ রুট তাই মানাবাড়ি বা পাথরঝোরা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে। সরু পিচের রাস্তা। চিলোনি, চাপ, শিরীষ, শিমূল, কৃষ্ণচুড়া, জারুল, বসন্তে যেন নানা রঙের মিছিলে বর্ণময় চিত্র। ক্লান্তিবোধ করলে গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরোনো যাবে। রূপসী ডুয়ার্সের পথে-প্রান্তরে অনেক নদী, পাহাড়ি ঝোড়া, সবুজ অরণ্য। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। লিস, ঘিস, চেল, ছন্দ মিলিয়ে সুন্দর সব নদীর নাম এবং পাহাড়ের কোলে এ রকমই এক অসাধারণ সৌন্দর্যখনি পাথরঝোরা অবশ্য পর্যটন মানচিত্রে নেই। কখনো কোনও নিঃসঙ্গ পথিক অথবা বোহেমিয়ান পর্যটক পথ ভুলে যেন চলে আসেন পাথরঝোরার কাছে।

গজলডোবাকে চিরে বেরিয়েছে তিস্তা ক্যানেল। পাশেই গড়ে উঠেছে 'ভোরের আলো'। কিন্তু শুধুমাত্র পর্যটনেই নয়, রাগবিতেও নিজের পরিচিতি চাইছে গজলডোবার নতুন প্রজন্ম। গজলডোবার সরস্বতীপুর চা বাগানের ছোট্ট একটি গ্রামে আমেরিকার জনপ্রিয় খেলা রাগবিতে মজে রয়েছে সরস্বতীপুর বাগিচার ছোট একটি গ্রামের ছেলে মেয়েরা। গুদাম লাইনের মাঠে এবং নদীর পাড়ে প্রায় ৫০০ জন কিশোর কিশোরী খেলার পাঠ নিচ্ছেন। আদিবাসী গ্রামটির চারপাশেই বৈকুণ্ঠপুর এর জঙ্গল। চা বাগিচার শ্রমিক পরিবারের একেবারে সদ্য হাঁটতে শেখা মেয়েটির হাতেও রাগবি বল। ৪ বছরের দয়ালু ওঁড়াও থেকে ৩০ পেরোনো যুবক দীপু ওঁড়াও সকলেরই প্রিয় খেলা রাগবি। গত আড়াই বছর ধরেই এই রাগবিতে মজে রয়েছে সরস্বতীপুর চা বাগান। চা বাগানের মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড় হিসাবে জাতীয় স্তরের সাফল্য পেয়েছে। বাকি চার রাত বিভক্ত কিশোর কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের রাগবি খেলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাজ্য রাগবি দলের কোচ রোশন শাসা যিনি সরস্বতীপুর গ্রামেই থাকেন। একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ নিয়ে সরস্বতীপুর চা বাগান থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম আনন্দপুর চা বাগিচার উদ্দেশে। ক্যানেল রোড ধরে আনন্দপুর চা বাগিচাকে কেন্দ্র করে গিয়েছি কৈলাসপুর,যোগেশচন্দ্র, নেপুচাপুর, গজলডোবা, নেওরা নদী, ডামডিম, কুমলাই ইত্যাদি চা বাগিচাগুলিতে।

এরপর চায়ের জনপদ মেটেলির সুহানা সফর শুরু হল চালশা থেকে। সামসিং এর বাস ধরে চালসা গোলাই থেকে পাহাড় উজিয়ে যাত্রা মেটেলির দিকে। সামান্য উঁচু হলেও পাহাড়ের সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে চালসা থেকে মেটেলির যাত্রাপথে। মেটেলি, নাগেশ্বরী, জুরান্তী, এনগো, চিলোনি, চালসা, সামসিং, ইংডং, কিলকট,

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

গজলডোবার সরস্বতীপুর চা বাগানের ছোট্ট একটি গ্রামে আমেরিকার জনপ্রিয় খেলা রাগবিতে মজে রয়েছে সরস্বতীপুর বাগিচার ছোট একটি গ্রামের ছেলে মেয়েরা। গুদাম লাইনের মাঠে এবং নদীর পাড়ে প্রায় ৫০০ জন কিশোর কিশোরী খেলার পাঠ নিচ্ছেন। আদিবাসী গ্রামটির চারপাশেই বৈকুণ্ঠপুর এর জঙ্গল। চা বাগিচার শ্রমিক পরিবারের একেবারে সদ্য হাঁটতে শেখা মেয়েটির হাতেও রাগবি বল। ৪ বছরের দয়ালু ওঁড়াও থেকে ৩০ পেরোনো যুবক দীপু ওঁড়াও সকলেরই প্রিয় খেলা রাগবি।

সোনগাছি বাগানগুলি পর্যায়ক্রমে ঘুরে দেখা হল। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা যায় নিচে চালসার ছোট্ট জনপদ। তারপর গরুমারা অরণ্যের বিস্তার আর মূর্তি, কুর্তি, নেওড়া দূরে রুপোলি দেখার মত দিগন্তে মিলিয়ে যায়। বর্তমানে যেখানে চিলোনি চা বাগানটি অবস্থিত সেখানে ছিল চিলৌনি গাছের জঙ্গল যা এই চা আবাদ অঞ্চল জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই চিলৌনি গাছের জঙ্গল থেকেই চা বাগিচার নামকরণ হয়েছে চিলোনি বা চালুনি। চিলোনি অত্যন্ত সুন্দর একটি বাগান। এর উত্তরে কালিম্পং জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং পর্বতশৃঙ্গের সমাহারে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা বাগানের সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। চিলৌনি চা বাগিচার পাশেই সামসিং, মেটেলি, নাগেশ্বরী, এঙ্গো এবং জুরান্তি চা বাগান সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে অবস্থিত।

তিস্তা নদীর তীরে প্রাচীন শহর জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝার টি এস্টেট। সামনে বিস্তৃত উর্বর কৃষিজমি এবং সবুজ চা বাগিচার মাঝখান দিয়ে স্রোতস্বিনী করলা দুহাত বাড়িয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের দিনে রঙ বেরঙের খেলায় সজ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন কাছে, আরও কাছে আসার আহ্বান জানায়। পলিটেকনিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে দুটি ছোট্ট নদী ধরধরা এবং রুকরুকা। দুই নদী যেন মিষ্টি দুই যমজ বোন। চা বাগানের বুক চিরে চলে গেছে রেললাইন, যেটি বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে নর্থ-ইস্ট এর যোগসূত্র স্থাপন করেছে। পাশাপাশি রায়পুর, জয়পুর, ভান্ডিগুরি এবং শিকারপুর ভান্ডারপুর চা বাগিচায় গিয়েছি।

উত্তরবাংলার পরিকাঠামোহীন চা বাগিচাগুলির কর্মহীন শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটাতে বন্দুক থেকে তপ্ত সীসা ছুড়তে হয় না। শ্রমিকেরা তাদের চা বাগিচার পর্ণকুটিরের ভাঙা দাওয়াতেই দিনের পর দিন ভাতের জন্য অপেক্ষা করে, তারপর শূন্য পাকস্থলির দাবি মানতে না পেরে ফুসফুসের শেষ রায়টুকুকে বার করে দিয়ে বাঁচার অধিকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির মুখে লাথি মারে। এই পর্বের ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ্য করলাম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সরকার নিছক দর্শকই। ট্রেড ইউনিয়নের ট্রেডের সাইনবোর্ড আছে, আন্দোলনের নেতা আছে, কিন্তু নেতৃত্ব নেই। পথ আছে, দিশা দেখাবার জন্য পথপ্রদর্শক নেই। আইন আছে, কিন্তু শ্রমিকের বাঁচার জন্য আইনের দন্ড নেই। কারখানার গেটে তালা ঝোলানোর জন্য মালিকের হাতে তালা আছে, বন্ধ তালা খুলবার জন্য সরকার এবং শ্রমিকের হাতে চাবি নেই। এদের সুখ আর ওদের অসুখ। এই মন্তব্যের সারকথা হল চায়ের বাজারের সুফলের জন্য চা মালিকরা সুখে থাকেন, অন্যদিকে আর্থিক অনটনের শিকার চা শ্রমিকরা অস্বস্তিতে অর্থাৎ গভীর অসুখে আক্রান্ত।

একদিন চোখে পড়ল রংধামালি জলপাইগুড়ি সিটি অটোর ভিতরে ঠাসাঠাসি ভিড়ে এমনকি গাড়ির মাথায় ব্যাগের স্তূপের উপরেও অনেকে বসে, দরজা-জানলা এমনকি পিছনে ঝুলেও অনেকে চলে যাচ্ছেন বাগিচা ছেড়ে। কৌতুহলি হয়ে জানলাম ওরা কাজের সন্ধানে যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে। মালিকপক্ষের অভিযোগ থাকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। তাদের বক্তব্য শ্রমিকদের একাংশের নিজেদের মধ্যে বিরোধের কারণে পরিচালনার কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। একা একশ শ্রমিক পুরো দিনের কাজ

করলা ভ্যালি চা বাগানের পরিচর্যা

এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির দুর্গ ছিল জেলার চা বাগিচাগুলি। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মালবাজার এবং মেটেলিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই ভিত আজ আর নেই বলাই বাহুল্য। জাতপাত, সম্প্রদায়গত সংঘাত নেই বললেই চলে। কিন্তু অবক্ষয়, চোখরাঙানি, বিরোধী দমননীতি শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যকে যে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই তথ্য দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

করে না। তখন বাগানে স্থায়ী শ্রমিকের বদলে কাজে লাগানো হয় অস্থায়ী সস্তার শ্রমিকদের। অন্যদিকে চা শ্রমিকদের বক্তব্য শীতের শুখা মরশুমে চা-পাতা ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। শীতকালে পাতা তোলা বন্ধ হয়ে গেলে মালিকের অনুপস্থিতিতে চলবে কেমন করে সেটা ভেবেই অনেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নেয়। শতাধিক বাসিন্দা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে বিকল্প পথে রোজগারের চেষ্টা করে।

মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সংখ্যাটাও খুব একটা কম নয়। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ফ্যাক্টরি, পরিত্যক্ত শ্রমিক আবাসগুলিও ভুতুড়ে বাড়ির আকার ধারণ করেছে বহু বাগানে। অথচ যেগুলিতে মানুষ রয়েছে তার অনেকগুলিতেই আবার ডিস এন্টেনা সহ টিভিও আছে। প্রতিটি শ্রমিক মহল্লাতে আছে দোকান ঘর, নানা ধরনের চাট সহ শুঁড়িখানা। বাগানে পড়ে থাকা চা শ্রমিকেরাই চা পাতা তোলা, হাত মালাই ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। ফাউলাই মিলছে অধিকাংশ বন্ধ বাগানে পনেরশো টাকা করে। সরকারি রেশনে মিলছে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি করে চাল এবং আটা। ১০০ দিনের কাজও মিলছে। পাশাপাশি আছে নদী থেকে বালি পাথর তোলার কাজ আর ১০ বছরের শিশু শ্রমিক থেকে শুরু করে বুড়ো শ্রমিক সবাই প্রায় সেই কাজে হাত লাগিয়ে পাচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। প্রায় সমস্ত শ্রমিকের ঘরে ঘরে চলে এসেছে অন্ততপক্ষে দুটি সাইকেল। মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে এবং তার জন্য নানা প্রকল্পের টাকা হাতে আসছে। এক কথায় কাঁচা টাকা, কিন্তু বন্ধ খোলা অচল সব চা বাগানে পৌছে যাচ্ছে নিয়মিত।

এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির দুর্গ ছিল জেলার চা বাগিচাগুলি। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মালবাজার এবং মেটেলিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই ভিত আজ আর নেই বলাই বাহুল্য। জাতপাত, সম্প্রদায়গত সংঘাত নেই বললেই চলে। কিন্তু অবক্ষয়, চোখরাঙানি, বিরোধী দমননীতি শাসকশ্রেণির প্রাধান্যকে যে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই তথ্য দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। প্রকৃতপক্ষে বাংলার চা শ্রমিকদের মজুরি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই অন্যান্য সংঘটিত শিল্পের শ্রমিকদের মজুরির থেকেও কম। গত দেড়শ বছর ধরে ওদের মজুরি যা ছিল বা আজও যা আছে তা শুধুমাত্র বাংলা নয় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে কমবেশি একই রকম। দীর্ঘ বঞ্চনার কষ্ট এবং শ্রমিক নেতাদের ভন্ডামি গুন্ডামি সহ্য করার পর ডুয়ার্সের চা বাগানে যে আশার আলো তৈরি হয়েছিল নতুন সরকারকে ঘিরে, গত ছয়-সাত বছরে তা ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়েছে। তাই বাগিচা শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি নিয়ে বাগিচার মজদুর নেতাদের আরও জোরালো সংগ্রামে নামতে হবে সে সত্য সবার জানা, কিন্তু আজকের রাজনীতিতে তা কি আদৌ সম্ভব?

বিভাজিত জলপাইগুড়ি জেলার বাকি চা বাগানগুলির হাল হকিকৎ নিয়ে ফের হাজির হওয়ার ইচ্ছে রইল, যত শীঘ্র সম্ভব।

ভীষ্মলোচন শর্মা

বেলাকোবায় এক বেলা

"বেলাকোবার চমচম ভালো
পাস্তুয়া ফুলবাড়ির
ভাবতে ভাবতে খবর হলো
পাঁচটা দশের গাড়ির
বিশ পয়সার বাদাম কিনে
খাচ্চি আমরা দু-জন
আমরা মানে আমি এবং
আমার বন্ধু সুজন।"

জলপাইগুড়ির অধুনা বিস্মৃত কবি রবি ভট্টাচার্য লিখেছিলেন গানটি। যে যুগে বিশ পয়সার বাদাম দু-জন মিলে খাওয়া যেত, সে যুগ থেকেই বেলাকোবার চমচম। কিন্তু চমচমের কাহিনি থাক। বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের দক্ষিণে থাকা বেলাকোবা আর তার লাগোয়া ভাটিপাড়া, নতুনবস, মন্থনি, শিকারপুর, এসব জনপদ প্রাচীন বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের স্মৃতি বহন করছে। সবাই জানে যে কোচবিহারের বিশ্বসিংহ আর বৈকুণ্ঠপুরের শিষ্যসিংহ দুই ভাই। শিকারপুরের কাছেই ছিল প্রাচীন বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানি। দুশো বছরের কিছু আগে সেটা চলে এসেছিল জলপাইগুড়িতে। করলা নদী বেয়ে সেকালের বৈকুণ্ঠপুরের মানুষ এসে পড়তেন তিস্তায়। তারও আগে করতোয়ায়। হয় তো। সেই বিরাট ভূমিকম্পের আগে যখন করতোয়া ছিল বিপুল, আর একালের তুলনায় শীর্ণ তিস্তা গিয়ে মিশত পদ্মায় তখন এই রাস্তা ছিল গভীরতম অরণ্য।

জলপাইগুড়ি লাগোয়া গোশালা মোড় থেকে সোজা উত্তরে সেই রাস্তা দিয়েই কার্তিকের বিষণ্ণ দুপুরে হুস হুস করে ছুটছিল আমাদের বাহন। এখন এই চমৎকার রাস্তা দিয়ে বহু যানবাহন শিলিগুড়ির দিকে যায়। অনেককাল আগে এটাই ছিল শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার মূল পথ। এই পথে বৈকুণ্ঠ পুর রাজ্যের ভেতর দিয়ে পথিককে পৌঁছে দিত এক গভীর অরণ্যভূমে।

সেই বিরাট ভূমিকম্পের আগে যখন করতোয়া ছিল বিপুল, আর একালের তুলনায় শীর্ণ তিস্তা গিয়ে মিশত পদ্মায় তখন এই রাস্তা ছিল গভীরতম অরণ্য। অনেককাল আগে এটাই ছিল শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার মূল পথ। এই পথে বৈকুণ্ঠ পুর রাজ্যের ভেতর দিয়ে পথিককে পৌঁছে দিত এক গভীর অরণ্যভূমে।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পাশে রেখে, ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান পেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর বাঁ দিকে বাঁক নেবে রাস্তা। সোজা গেলে ভ্রামরী দেবীর মন্দির। এরই মধ্যে খানিকটা পথ এসেছি রায়পুর চা বাগানকে পাশে রেখে। সামনেই জয়পুর চা বাগান। চকচকে আঁকাবাঁকা রাস্তা সে বাগানের মধ্যে দিয়ে ভারি সুন্দর দৃশ্য রচনা করেছে। করলার ওপর নতুন সেতু। পাশেই ইংরেজ আমলের সরু ব্রিজটি চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। এখনও কর্মক্ষম।

ভাবতে ভাবতেই বেলাকোবা এসে গেল।

বেলাকোবা স্টেশনটা নর্থ-ইস্টে যাওয়ার মূল লাইনের ওপর ব'লে সারাদিন ট্রেন যাওয়া-আসার বিরাম নেই। কিন্তু হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার বাদ দিলে এখানে কেবল দাঁড়ায় তিস্তাতোর্ষা এক্সপ্রেস। স্টেশানে যাওয়ার রাস্তাটি বেশ খারাপ আর ঘন ঘন লেবেল ক্রসিং বন্ধ হয় বলে সে রাস্তার মুখে প্রায়ই জট বেঁধে যায়। একদা বেলাকোবার বিখ্যাত চমচম রাস্তার এই মুখটিতেই একটিমাত্র দোকানে মিলত। হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জারে চেপে সে চমচম ভক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রথমবার বেলাকোবা এসেছিলাম।

এবার অনেক দিন পরেই এলাম।

মাঝে মধ্যে শিলিগুড়ি যাওয়ার কারণে যে বেলাকোবার ওপর দিয়ে যাই নি, তা নয়। কিন্তু বেলাকোবাকে দেখতে অনেক দিন পরেই এলাম। চমচমের পুরনো দোকানটি আর নেই। বদলে অনেক নতুন দোকান। সকলেই 'বিখ্যাত' চমচম বিক্রি করছে। সামনে দিয়ে তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তা চলে গেছে ফাটাপুকুরের দিকে। এই রাস্তা বরাবর বেড়ে উঠছে নতুন বেলাকোবা। চোখে পড়ল। লেখার শুরুতে যে গানটির উল্লেখ করলাম, তাঁর সুরকার পড়েছিল বেলাকোবার কিশোরীর প্রেমে। সেই প্রেমরূপ কাবাবের

হাড্ডি হয়ে একবার আসতে হয়েছিল এখানে। সেটাই ছিল প্রথমবার বেলাকোবাকে ঘুরে ফিরে দেখা।

সেই বেলাকোবা এখন নেই। আবার আছেও। শৈশবে বাড়ি আঁকার সোজা ফর্মুলা ছিল একটা। আয়তক্ষেত্রের মাথায় একখানা ত্রিভুজ বসিয়ে দেওয়া। তারপর দুটো বর্গাকার জানলা আর একটা লম্বাটে দরজা। ধুলোময় হেমন্ত অপরাহ্নে হাসপাতাল পাড়ার দিকে যেতে যেতে দেখলাম তেমন বাড়ি এখনও চোখে পড়ছে। সেই পাড়াতেই স্কুল, পাশে খেলার মাঠ, তার পাশে রেললাইন— যেন বেলাকোবার সেই পুরনো চেহারা। হাসপাতালের উল্টোদিকে অনেকটা জায়গা নিয়ে, গাছপালা আর প্রাচীরে ঢাকা বিখ্যাত 'রায়বাড়ি'। মনে হলো রায়বাড়িটাকে ঠিক এই রকমই দেখেছিলাম 'কাবাব মে হাড্ডি' হওয়ার দিনটায়।

ফাটাপুকুরের দিকে দৌড়োবার জন্য চওড়া আর চকচকে রাজ্য সড়কের কারণে বেলাকোবায় যে বদলটা হয়েছে, তার ছাপ হাসপাতাল পাড়ার ঘরোয়া পরিবেশে এখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। শুধু কয়েকটা বাড়ি হাল ফ্যাশানের হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে সে সব ছোটখাটো বাড়িগুলোকে বেশ সুন্দর লাগছিল। অনেক বাড়ির সামনে দেখলাম 'টু লেট' ঘোষণা ঝোলান।

রেল স্টেশানের সামনে ছোট একটা মন্দির। বটবৃক্ষের শিকড়ের গুঁতোয় তিনি সামনের দিকে হেলে পড়েছেন। কয়েকটা দোকান। তার একটিকে বেছে নিয়ে দোকানিকে বললাম চা বানাতে। কপালে রসকলি আঁকা এক পরিবার বেশ কিছু লাগেজ নিয়ে হেলতে দুলতে এসে খোঁজ করলেন তিস্তাতোর্ষা কখন আসবে। তাঁরা যাবেন নবদ্বীপ। নো রিজার্ভেশন। জেনারেল কামরায় জায়গা মিলবে কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। দোকানি আমাদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি চায়ে জল দিই না। কেবল দুধ।'

জানা গেল তিনি রেলের প্রাক্তন কর্মী। বেলাকোবায় কারা বাড়ি ভাড়া খোঁজে, সেটা জিগ্যেস করলাম। জানা গেল, সেখানে অনেক এমন বাড়ি আছে যার মালিকেরা পরলোকে চলে গেছেন। উত্তরাধিকারিরা থাকে বাইরে। সে সব বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু বেলাকোবায় রেলের লোক যাঁরা আসেন, বেশির ভাগই থাকেন কোয়ার্টারে। সরকারি চাকরি করতে আসা লোকেরা থাকে জলপাইগুড়ি কি শিলিগুড়িতে। ভাড়াটের নিতান্তই অভাব।

অভাবের ফল টের পেলাম খানিক পর একটা চমৎকার বাড়ির সামনে টু লেট বোর্ড দেখার পর তার ভাড়া জানতে চেয়ে। লাগোয়া ছোট্ট দোকানের মালিক বললেন, 'তিনটে বড়ো ঘর আছে। বড়ো বারান্দা। ভাড়া আড়াই হাজার।'

বাড়ির মালিক অবশ্যই থাকেন না। দায়িত্ব দিয়ে গেছেন দোকানিকে। ভাবলাম, যদি কোনও দিন অজ্ঞাতবাসে যেতে ইচ্ছে হয়, তবে ফোনটোন বন্ধ করে বেলাকোবাতে বাড়ি ভাড়া করে থাকব। এরপর দোকানি এমন একটা তথ্য দিলেন যাতে উৎসাহ বেড়ে গেল। জলপাইগুড়ির কোনও এক ব্যক্তি নাকি রিটায়ার করার পর নিজের বাড়ি বারো হাজারে ভাড়া দিয়ে এখানে দেড় হাজারে ভাড়া নিয়ে দিব্যি দিন কাটাচ্ছেন!

হাতে সময় ছিল না। নইলে লোকটিকে খুঁজে বের করতাম।

অদূরে নবান্ন। বেলাকোবার আশপাশে অনেক ধানবাড়ি সোনালি আমন ধানে ভ'রে আছে। কোনও কোনও ধানবাড়ি সার সার শুয়ে আছে কাটা ধানগাছ। ক্লান্ত হেমন্ত সন্ধ্যায় এই সব খেতের ওপর নেমে আসবে কুয়াশার রহস্যময় চাদর। ক্ষয়াটে চাঁদের আলোয় মনে

গজলডোবা এবং তারপর লাটাগুড়ি যাওয়ার খরচ আর সময় দুটোই কমে যাবে। শেয়ালদা থেকে আসা তিস্তাতোর্ষা বেলাকোবায় থামে শেষ রাতে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটক স্টেশানে নেমে পড়তে পারেন। ঠকবেন না। কারণ, আপনি দেখবেন ডুয়ার্সের প্রবল গন্ধমাখা একটি জনপদ। ফোর জি নেটওয়ার্ক কাজ করে। সেখানে চমৎকার একটি ভোর উপভোগ করে সক্কাল সক্কাল পৌঁছে যেতে পারবেন ভোরের আলোয়।

হবে দিগন্ত বিস্তৃত কুয়াশার দিঘি। আমাদের গাড়ির ছোকরা চালক বেজায় নিরামিষ। পান-সিগারেট দূর অস্ত, অনেক বার বলে এক কাপ চা খাওয়ান গেছে। কিন্তু চমচম খাওয়ার প্রস্তাব দিতেই তিড়িং করে লাফিয়ে বলল, 'চলেন। এক জায়গায় নিয়ে যাই।'

স্টেশন রাস্তার মোড়ে অতীতে যে চমচমাপণটি ছিল, তাঁর মালিক অমৃতলোকে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারি নাকি বাড়িতেই চমচম ফ্যাক্টরি খুলে সেখান থেকেই বিক্রি করেন। চালক তাঁর বাড়ি গেছিল পক্ষকাল আগে। খেয়েও এসেছে। প্রবল উৎসাহে সে একটা গলিপথে ঢুকে পড়ল গাড়ি নিয়ে। সরু গলি। দু-পাশে বাড়িঘর। রাস্তা ভাঙা। খানিক ঘোরাঘুরির পর সে একটা মাঠের পাশে এসে থামল। সেখানে দুর্গাপুজোর চিহ্ন এখনও লেগে আছে। রাস্তার অপর পাশে একটা ভগ্নস্তূপ। চালক হতাশ গলায় বলল, 'এটাই তো ছিল।'

খোঁজখবর করে জানা গেল যে তিনি সত্যিই ছিলেন। কিন্তু তাঁর নাকি নিয়মিত চমচম বানাতে ঘোর অনীহা। কয়েক দিন হল বানাচ্ছেন না। পরের গলিতেই তাঁর ভাইস্তার মিষ্টির দোকান। অতঃপর চমচম ভক্ষণ। ভালই। তবে আহামরি কিছু লাগল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জিভের তেজ কমে গেছে নাকি চমচম আর আগের মত নেই— এ তর্কটা থাক।

মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'ভোরের আলো' ওরফে গজলডোবা এখান থেকে কাছেই। জোর আধঘণ্টার পথ। শিকারপুরের অধুনা ভস্মীভূত 'দেবী চৌধুরানীর মন্দির'ও বেশি পথ নয় মোটেই। গতবার দোমোহানির কথা লিখেছিলাম। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেলাকোবাও কিন্তু দোমোহানির মত উত্তম জায়গায়, অথচ জনঘনত্বের বিচারে দুটো জায়গাই সমান লঘু। তবে, ফাটাপুকুরগামী রাজ্য সড়ক উন্নত হওয়ার কারণে বেলাকোবায় কিছুটা হলেও উত্তেজনা এসেছে। মনে হল যে, ভবিষ্যতে যখন জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি একটাই জায়গা হয়ে যাবে, তখন ফাটাপুকুর টু বেলাকোবা হয়ে উঠতে পারে জমাটি একটা জায়গা। কলকাতা থেকে আসা ট্রেন যদি এখানে থামে তবে পর্যটকের পক্ষে গজলডোবা এবং তারপর লাটাগুড়ি যাওয়ার খরচ আর সময় দুটোই কমে যাবে। শেয়ালদা থেকে আসা তিস্তাতোর্ষা বেলাকোবায় থামে শেষ রাতে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটক স্টেশানে নেমে পড়তে পারেন। ঠকবেন না। কারণ, আপনি দেখবেন ডুয়ার্সের প্রবল গন্ধমাখা একটি জনপদ। ফোর জি নেটওয়ার্ক কাজ করে। সেখানে চমৎকার একটি ভোর উপভোগ করে সক্কাল সক্কাল পৌঁছে যেতে পারবেন ভোরের আলোয়।

ক্লান্ত সন্ধ্যা দূরে নেই। জয়পুর বাগানের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসছি। হঠাৎ সামনে ঢাকের শব্দ, তুমুল নাচগান আর কী কান্ড! দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে বিসর্জনে যাচ্ছে একদল! লক্ষ্মীপুজো পেরিয়ে আজ কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী বোধহয়। এখন বিসর্জন? তারপরেই মনে পড়ল, এ বোধহয় বনদুর্গার বিসর্জন। এইসব এলাকার নিজস্ব দুর্গাপূজা। দুর্গা মোটেও দশমীর দিন যান না। ভাটি বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে তিনি এ তল্লাটে থাকেন কয়েক দিন। কালীপুজোর হাওয়া তুলে দিয়ে তারপর ফিরে যান জল্পেশ্বরের ডেরায়।

দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল। তাহলে পর্যটক! আর দেরি কেন? দশমীর পর দুর্গাপুজো দেখতে চাইলে চলে আসুন বেলাকোবায়। তারপর আপনাকে গন্তব্যে এলাকার যানবাহন ঠিক পৌঁছে দেবে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮

নির্বাচিত প্রথম ৫৫ জন

অভিষেক ঠাকুর

অভিশ্রুতি রায়

অদিতি দে

ঐতিহ্য মজুমদার

অমিত পাল

অনিমেষ চৌধুরী

বলরাম পাল

বিশ্বব্রত রায়চৌধুরী

ভাস্কর কুমার দাস

দুর্জয় দাস

বিরুপাক্ষ মিত্র

গৌতমেন্দু নন্দী

মৃন্ময় দাস

চিন্ময় ঘোষ

দিব্যজ্যোতি সরকার

দেববর্ণ সরকার

গোলাম নবী আজাদ

দেবাশিস সরকার

অনন্যা সিকদার

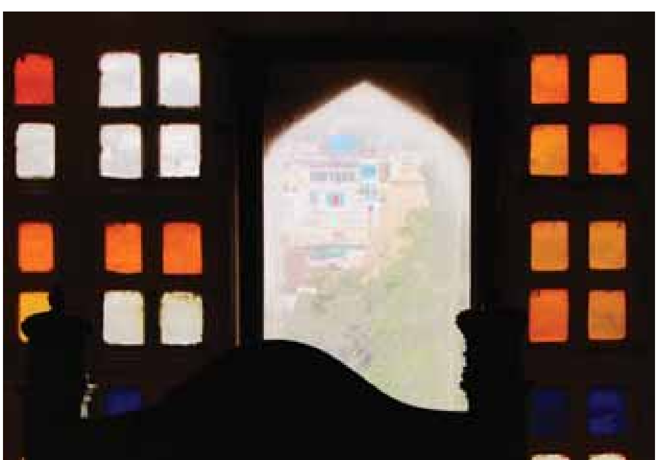
গার্গী সিনহা

অনুভব

হিতেন দাস

জিষ্ণু ব্যানার্জি

ইন্দ্রনীল সরকার

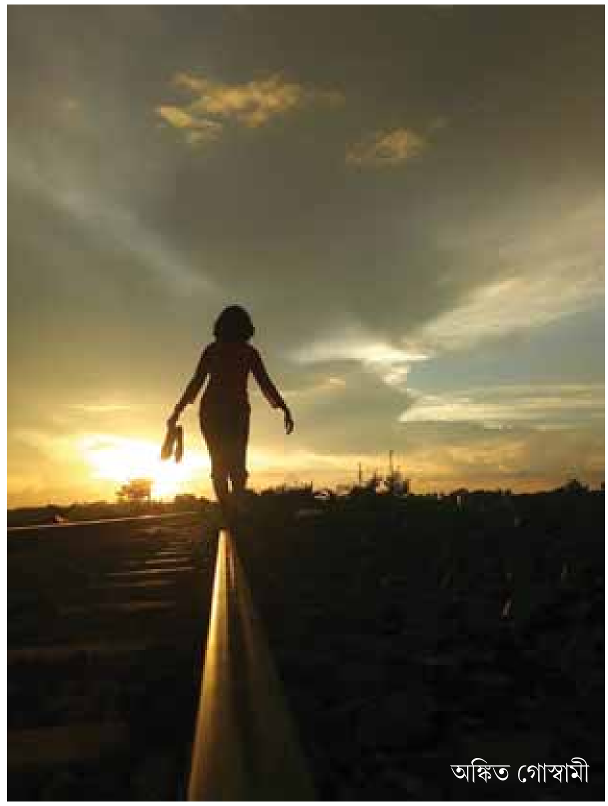
অঙ্কিত গোস্বামী

জয়ন্ত ঢ্যাং

প্রিয়ংশী দাস

অনিশ বেরা

অর্ক ঘোষ

কনিশা বাগচি

রাজশ্রী সাহা

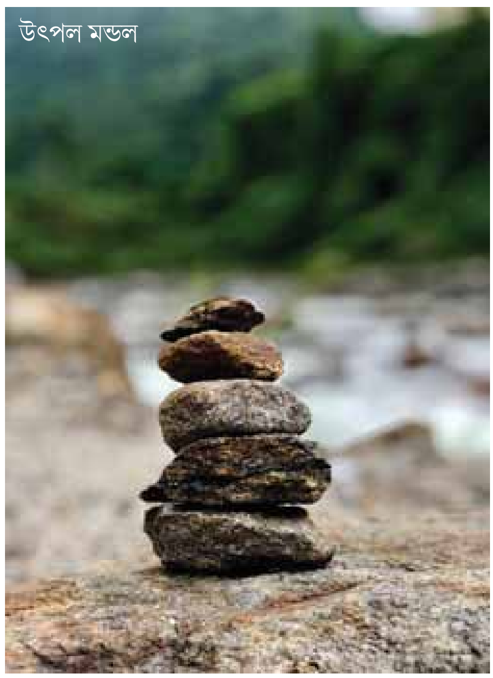
উৎপল মন্ডল

সুদীপ্ত মন্ডল

মন্টু রায়

অম্লান দাশগুপ্ত

শ্যামন্তক বসু

নান্টু দাস

সুমন মুখার্জি

অনিশ দে

পিয়ালি দাস

শর্মিষ্ঠা রায়

কপিলদেব রায়

প্রিয়া সরকার

লাবণী পাল

রাজু দাস

নির্বান চক্রবর্তী

হিমাংশু রায়

শুভজিৎ সেন

অরজিৎ মালোদাস

গৌরব বোস

অভিশ্রুতি রায়

মৌরিমা বসু

তনুজ মল্লিক

পৃথ্বীরাজ গনি

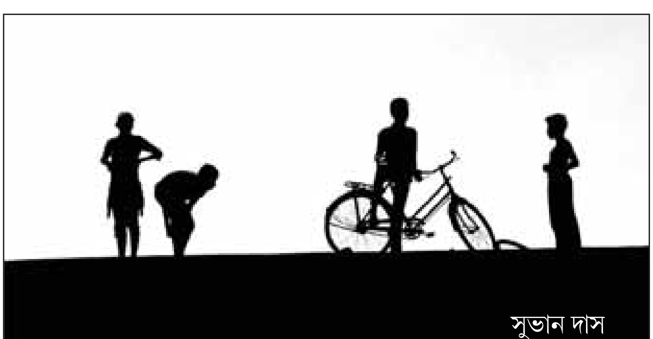

সুভান দাস

নির্বাচিত সেরা পাঁচটি ছবি প্রকাশিত হবে
আগামী ডিসেম্বর ২০১৮ সংখ্যায়।
বিচারক কমিটির প্রধান গৌতমেন্দু রায়।

রয়্যাল হোম স্টে

জয়েন্ট ফ্যামিলির সুবিধে অসুবিধে নিয়ে রচনা লিখতে গিয়ে স্কুলে ভুলু লিখে এসেছিল, 'যেখানে একই বাড়িতে অনেক লোক একসঙ্গে থাকে তাকে জয়েন্ট ফ্যামিলি বলে, এমনকি তারা আত্মীয় হতেও পারে নাও পারে'। এরপর বাবার কাছে চড়টা খাওয়ার একটাই কারণ ছিল বুঝতেই পারছেন ওই শেষ অংশটার ভুলের জন্য। আসলে ভুলুর দোষ নেই, ও যেরকম দেখে এসেছে সেটাই তো লিখবে। দাদা, কাকা, জ্যাঠা বলে ডাকতে শেখাচ্ছে অথচ কস্মিনকালেও তাদের সে চেনেই না, তারাও এ বাড়িতে খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে আবার কিছুদিন বাদে চলেও যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার রোজ দুপুরে এসে শুধু খেয়েই যায় আর কখনোই তাদের দেখা যায় না। কী করে বেচারা বুঝবে জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে কেবল তার পরিবারের লোকেরাই। যাদের সে চেনে না, তারা যে তার পরিবারের নয় সেটা নিয়েও তো ধন্দের শেষ নেই। ফলে ভুলুর সাদামাটা কথার ভাল ভাষা করলে দাঁড়ায়, আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই মিলে

মিরিকে যাননি এমন মানুষ বোধহয় খুঁজলে একটাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মিরিকে গিয়ে নাইট স্টে, এটা খুব বেশি নেই। বেশিরভাগেরাই লেকের ধারে টাইম পাস করে মাছকে খাইয়ে দিনে দিনে গিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু একটা দিন থাকা যেতেই পারে ফুব সাং-এর বাড়িতে। ব্যাপারটা যে খুব আলাদা কিছু, সাংঘাতিক অন্যরকম রোমাঞ্চকর কিছু তা নয় কিন্তু যারা নির্জনতা ভালবাসেন তাঁদের জন্য কিন্তু ফুবের বাড়ি একটি আদর্শ আস্তানা হতে পারে।

একটি পরিবারের ভাল-মন্দের শরিক হয়ে সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ার ফলে যে বিশালাকৃতি ফ্যামিলি তৈরি হয় তাকেই জয়েন্ট ফ্যামিলি বলে। তার মানে ভুলুও ঠিক 'ফুব'-ও ঠিক। হ্যাঁ ফুব। ফুব সাং। এমন একটি মেয়ের নাম যাকে দেখলে আপনার ইচ্ছে করবে শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন দিনের পর দিন ওর জন্যেই ওর বাড়িতে রয়ে যাই।

মিরিকে যাননি এমন মানুষ বোধহয় খুঁজলে একটাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মিরিকে গিয়ে নাইট স্টে, এটা খুব বেশি নেই। বেশিরভাগেরাই লেকের ধারে টাইম পাস করে মাছকে খাইয়ে দিনে দিনে গিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু একটা দিন থাকা যেতেই পারে ফুব সাং-এর বাড়িতে। ব্যাপারটা যে খুব আলাদা কিছু, সাংঘাতিক অন্যরকম রোমাঞ্চকর কিছু তা নয় কিন্তু যারা নির্জনতা ভালবাসেন তাঁদের জন্য কিন্তু ফুবের বাড়ি একটি আদর্শ আস্তানা হতে পারে। বাড়িটির নাম 'রয়্যাল হোম স্টে'। এটি তৈরি হয়েছিল যখন, তখন একটাই মাত্র কাঠের ঘর ছিল। সে তো ব্রিটিশ আমলের গল্প। তখন তো আর পরিস্থিতিটা এখনকার মত ছিল না। দার্জিলিং তৈরি হয়েছিল বটে কিন্তু দার্জিলিং-এ থাকার মত যথেষ্ট স্থানের অভাব রয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া ইংরেজদের আত্মীয় পরিজনেরাও এদেশে বেড়াতে আসতেন ছুটি কাটাতে অথবা জলহাওয়া বদল করতে। তখন তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত করা হত নিকটবর্তী অন্য কোনও শৈলাবাসে। তেমনই একটি শৈলাবাস ছিল এই বাড়িটি। কোনও নাম ছিল না। কিন্তু বাড়িটি বোঝাতে রয়্যাল কথাটা বলা হত বলেই সেই অনুযায়ীই এর এমন নামকরণ। যে সময়কার কথা, ফুব তখন ওর মায়ের মনের ইচ্ছে হয়ে থাকার মত সম্ভাবনাতেও নেই।

আমরা বংকুলুং থেকে মেইন রোড ধরে মিরিকের দিকে যখন যাচ্ছি তখন বেলা এগারোটা হবে। পুরো রাস্তাটা চওড়া এবং গভীর খাদের যে দৃশ্যে আমরা

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

রয়্যাল হোম স্টে-র অন্দর, ছবি রয়্যাল হোম স্টে-র সৌজন্যে

পাহাড়ে চড়লেই আমাদের বুক কাঁপে সেরকমও নয়। ডাইনে তাকালে সবুজ পাহাড়, বাঁয়ে তাকালে সবুজ পাহাড়, পেছনে তাকালেও তাই আর সামনে তো বটেই। সব পাহাড়ের গায়েই মোটা মোটা পিচের অজগর লেপ্টে লেপ্টে রোদ পোহাচ্ছে। বিদেশ বিদেশ করে আমার মত আদেখলাপনা যাদের একটু বেশি তারা এ হেন রাস্তায় পড়লে দু'চোখকে বিশ্বাস করতে পারবেনই না। ভারতবর্ষ এই সুন্দরীর নাম! আমার দেশ এটা! ইচ্ছে করবে, আয় বুকে আয় বলতে। মিরিকে যখন পৌঁছলাম, দুপুর তখন ও-কাত ফিরে শুয়েছে। বাজারে ঢুকে বেশ খানিকটা সরু তস্য সরু এক রাস্তা দিয়ে চলে শেষমেশ গন্তব্যের শুরুটায় উপস্থিত হলাম। বৌদির হোটেল। এরই ডান পাশ দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গেছে নীচের দিকে, খাড়া নীচের দিকে। প্রচণ্ড ভাঙাচোরা পথ ধরে দুলতে দুলতে নামতে লাগলাম তো নামতেই লাগলাম। যথারীতি আমাদের কালো ওয়াগনার আর স্টিয়ারিং-এ অতনু। অনেকটা পর বাঁয়ে টার্ণ নিতে গিয়েই দেখি ডান হাতে আমাদের আজকের আস্তানা। ঢুকেই মনটা ভরে গেল। কোথায় হারিয়ে গেল মিরিক বাজারের ওই হট্টগোল। প্রায় জনশূন্য একটা থাকার জায়গা। আহ কী আরাম, মনে মনে ভাবলাম। গাড়ি পার্ক করে এগোতেই হাসির ঝরনা তুলে এগিয়ে এল বছর বাইশের একটি মেয়ে। গায়ের রং ফর্সা, অবশ্য তেমনই হয়, ঠোঁটটা অল্প মোটা, চোখ দুটোতে যে কী যাদু আছে কে জানে, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কেবল ওকেই। ওর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কী? আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হাসতে হাসতে আর ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গী করে বলল, ফুব সাং। আলতো একটা ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। আমাদের লাগেজ টেনে নিয়ে গেল দুটো ছেলে। ফুব ঘর খুলে চাবি দিয়ে দিল হাতে। এক দিনের জন্য ওই ঘরের মালিক এখন আমরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর খোলামেলা সে ঘরে থেকেও আরাম।

ফুব ঘর খুলে চাবি দিয়ে দিল হাতে। এক দিনের জন্য ওই ঘরের মালিক এখন আমরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর খোলামেলা সে ঘরে থেকেও আরাম। 'রয়্যাল হোম স্টে' নামটা যে এমনি এমনি নয় তা বুঝতে পারলাম খেতে বসে। হরেক রকম পদে টেবিল সাজানো। স্বাদে গন্ধে অপূর্ব সেসব খাবার।

'রয়্যাল হোম স্টে' নামটা যে এমনি এমনি নয় তা বুঝতে পারলাম খেতে বসে। হরেক রকম পদে টেবিল সাজানো। স্বাদে গন্ধে অপূর্ব সেসব খাবার। নিজেদের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই সুয্যিমামা ঝুপ। ওই সময়টুকুর মধ্যেই লক্ষ্য করলাম নানান রকমের পাখি আছে ওখানে। অতনুর ছবি তোলার শখ। ফলে ক্যামেরা চোখে দিয়ে ওর মত ও। আমি যতক্ষণ পারলাম ফুব-এর সঙ্গে গল্প করে একটা চেয়ার নিয়ে একটা কোণায় গিয়ে বসলাম। সামনে বিশাল বিশাল পাহাড়ের মালা। রাত্তিরে জরির কাজের পোশাক পরে সে। সবাই দেখেছে সে সাজ। শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে কেবল।

ফুব কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের এই হোম স্টে কে করেছেন? তখন চালাতেন কে?" ফুব একটু আধটু আমতা আমতা করে এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলল, 'উনি জানেন'। ওঁর নাম আমার মনে নেই, কিন্তু তিনি যা বললেন তাতে ওঁর বয়সই দাঁড়ায় নব্বইয়ের ওপর। তিনি নাকি এ বাড়ির কেউ নন। কিন্তু তাঁর সম্মান ফুব-এর ঠাকুর্দার মত। তাঁর বাড়ি আরও নিচের দিকে। কিন্তু তিনি সকাল হলেই এখানে চলে আসেন আবার রাতে চলে যান। প্রায় পুরো দায়িত্বই ফুব আর ওর মায়ের। তবু তিনি আসেন। সামনের কাঠের ঘরখানা এখনো একইরকম আছে। ওখানে ইংরেজরা যখন থাকতে আসতেন তখন উনি ছোট্ট। ইংরেজরা সপরিবারে এলে তাঁদের একটু নিরিবিলি জায়গা লাগতো বলে এঁদেরই এক আত্মীয়, যিনি ওঁদের সঙ্গে কাজ করতেন তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এরকম একটি থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করতে। সেই অনুরোধেই এটির নাকি শুরু। সেই সময়কার সেসব গল্পই করছিলেন বুড়ো দাদা। তখন সবাই যে একই পরিবারের সদস্য ছিলেন তাও নয়, কিন্তু দেখভালের দায়িত্ব ছিল অনেকেরেই। সেই রেওয়াজ এখনো চলে আসছে দেখলাম। এখনো তাঁরা শাখাপ্রশাখাসহ বংশ-পরম্পরায় ওভাবেই রয়ে গেছেন। ফলে ফুবদের পরিবারও সেভাবেই অভ্যস্ত। আমি তো প্রথমটায় ঘাবড়েই গিয়েছিলাম ওদের রিলেশনশিপ বুঝতে গিয়ে। পরে বুঝলাম আসলে কেউই আত্মীয় নয়। কিন্তু ওই সেই ভুলুর রচনার মত, ফুব তো কাউকে অনাত্মীয় হিসেবে ভাবেই না, তাই ও বলতেও জানে না। ওর কাছে পুরোটাই জয়েন্ট ফ্যামিলি।

পরদিন সকাল থেকে পাখি দেখতে দেখতেই বেলা গড়িয়ে গেল। লাঞ্চ সেরে রওনা দিয়ে মিরিক লেকে এলাম। তারপর বাড়ির উদ্দেশে। এই একটা দিনের মধ্যে ফুব সাং-কে যেরকম দেখলাম এত মিশুকে, হাসিখুশি, বুদ্ধিমতী, এবং সুন্দরী খুব কম দেখেছি বেড়াতে গিয়ে। শুনেছি যারা খুব সুন্দরী হয় তারা নাকি খুব বুদ্ধিমতী হয় না, কিন্তু কই? আজও ওর ঝলমলে মুখটা চোখের ওপরে ভাসে। ছেলে হলে লুকিয়ে লুকিয়ে কবে আবার চলে যেতাম ওকে দেখতে।

শ্বেতা সরখেল

ছবি অতনু সরখেল

রয়্যাল হোম স্টে-র ফোন নং— ৭৮৭২২২৫৯০৭

স্বপ্নালোকে

উদ্‌যাপন উত্তরের দীপান্বিতা

মাঝেমধ্যেই বসে ভাবি, উত্তরবাংলার ঐতিহ্যময় জেলা শহর জলপাইগুড়িতে আমরা এক 'নেই রাজ্যের' বাসিন্দা হয়েই কাটিয়ে দিলাম গোটা জীবন। জলপাইগুড়ি শহরের দীর্ঘ দিনের মৌলিক দাবিগুলি আদৌ কোনওদিন বাস্তবায়িত হবে কিনা তা হয়ত পরম পিতারও অজানা। যেমন ধরুন সার্কিট বেঞ্চ। পরিস্থিতি অনুকূলে, শাসক বিরোধী সবাই রাজি, রাজ্য কেন্দ্র উভয়েই সহমত, তা সত্ত্বেও আজ অবধি বাস্তবায়িত হল না। ফার্মেসি কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। চা নিলাম কেন্দ্রটি অসহায় অপমৃত্যুর মুখে। জেলা শহর থেকে কলকাতা যাওয়ার সুপার ফাস্ট ট্রেন 'পদাতিক'-এর স্টপেজ চালু হয়েও দুম করে বিনা কারণে তুলে নেওয়া হয়। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজের কথা তো ভাবনাতেও নেই। ঘরে বাইরে সবাই যখন একপ্রকার ধরেই নিয়েছিল জলপাইগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে 'মস্করা ফাজলেমি' চলতেই পারে, ঠিক সেই সময়ই ভূমিকন্যা স্বপ্না বর্মনের স্বর্ণ সাফল্য যেন আমাদের নিরাশার অন্ধকারে বয়ে নিয়ে এল এক আলোর মশাল। কেবল জলপাইগুড়িই নয়, সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমগ্র ডুয়ার্স তরাই বাংলা।

ঘরে বাইরে সবাই যখন একপ্রকার ধরেই নিয়েছিল জলপাইগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে 'মস্করা ফাজলেমি' চলতেই পারে, ঠিক সেই সময়ই ভূমিকন্যা স্বপ্না বর্মনের স্বর্ণ সাফল্য যেন আমাদের নিরাশার অন্ধকারে বয়ে নিয়ে এল এক আলোর মশাল। কেবল জলপাইগুড়িই নয়, সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমগ্র ডুয়ার্স তরাই বাংলা।

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে পাতকাটা গ্রামের এক গরীব পরিবারের মেয়ে স্বপ্না যেদিন জাকার্তায় দেশের পতাকা উড়িয়ে জাতীয় সংগীতের সুরে উদ্বেল হয়ে সোনার পদক গলায় পরেছিলেন, তার পরদিন বিকেলে গিয়েছিলাম ওদের ঘোষপাড়ার বাড়িতে। বেলাকোবা হয়ে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির নতুন রাস্তায় পথে যাকেই জিজ্ঞেস করেছি সেই বলে দিয়েছে বাড়ির ঠিকানা। পিচ ঢালা পথ থেকে ডাইনে ঘুরতেই দেখেছিলাম তোরণ তৈরির কাজ চলছে। একটি প্রাইমারি স্কুলের সামনে হৈ হৈ করে কিছু মানুষ আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা সরু গলি পথ ধরে নিয়ে চলল সোনার মেয়ের বাড়ির দিকে। একটা বাঁকে বিদ্যুৎ দপ্তরের কিছু কর্মীকে দেখলাম পথ আটকে দাঁড়ানো বিদ্যুতের খুঁটি সরাতে ব্যস্ত। স্বপ্নাদের বাড়িটা ভাসছিল এক উজ্জ্বল আলোয়। উঠোনে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের ভিড়। স্বপ্নার মা এগিয়ে এলেন, ওর বাবাকে বেশ রুগ্ন মনে হল, দুজনকেই নমস্কার করে অভিনন্দন জানালাম। ছবি তোলার পর্ব শেষ করে অনুরোধ জানালাম এবছর কদমতলা দুর্গা পুজোর উদ্বোধক হিসেবে যেন আমরা স্বপ্নাকে সপরিবারে পাই। ফেসবুক মেসেঞ্জার হোয়াটস অ্যাপে তখন স্বপ্নাকে নিয়ে দিকে দিকে খুশির বন্যা বইছে। আশেপাশে বিস্তীর্ণ খেত, ধানগাছের কচি সবুজ পাতায় দিগন্ত ছুঁয়েছে। ভাবছিলাম এই আলের পথেই দৌড়ে বেড়াত দামাল মেয়েটা। চাষের নরম মাটিতে চলত লাগাতার অনুশীলন।

দিল্লি থেকে ডি পি রায় (মিঠু) এলেন। ইতিমধ্যেই ওর সঙ্গে কথা হয়েছে জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র শিল্পপতি মহেন্দ্র নাহাটার সাথে, একটা অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে স্বপ্নাকে। মিঠুর সঙ্গে আবার গিয়েছিলাম স্বপ্নাদের বাড়িতে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানালেন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী মিলিয়ে দুবেলায় দেড়শ'র মত লোকের পাত পড়ছে। পরিবারের সবাই মিঠুর কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা জেনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। উঠোনের একটা অংশ পাকা করার কাজ চলছে। স্বপ্নার মা বাসনা জানালেন, সরকার থেকে গ্রামের রাস্তাটা পাকা করা হবে বলে জানান হয়েছে।

পদকপ্রাপ্তির একমাসের মাথায় ২৮সেপ্টেম্বর বাগডোগরায় পৌঁছলেন স্বপ্না। সেখানে নানা অভ্যর্থনাপর্ব সম্পন্ন করে সন্ধে সাড়ে সাতটায় বাড়িতে। প্রচুর মানুষ অপেক্ষায় ছিল। ২৯ তারিখ সকাল থেকেই বাড়িতে দলে দলে মানুষ এসেছিলেন একবার স্বপ্নাকে দেখতে, তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। বিকেলে তাঁর নিজের ক্লাব রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। মঞ্চে প্রয়াত সমীর দাসের ছবি দেখে স্বপ্না কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সমীর দাসের হাত ধরেই একসময় শুরু স্বপ্নার দৌড়।

পরের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিল মূলত মহিলাদের পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সুচেতনা'। রায়কত পাড়া থেকে শতাধিক মোটর বাইকের মিছিল, পেছনে হুটার বাজিয়ে পুলিশ এসকর্ট সহ একাধিক গাড়ির বিশাল কনভয় নিয়ে সন্ধে সাড়ে ছয়টায় সুচেতনার অনুষ্ঠানস্থলে স্বপ্না এলেন। রিসেপশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাইক বাহিনী আব্দার করেছিল তাঁদের বোনের সাথে ছবি তুলবে। স্বপ্না সম্মতি জানাতে একমুহূর্ত বিলম্ব করেন নি। এদিকে ওর নতুন জুতোর

কোচবিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডঃ চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় যখন বলেছিলেন মন দিয়ে পড়াশুনো করলে হয়ত একজন উপাচার্য হওয়া যায় কিন্তু মন দিয়ে খেললেই একজন স্বপ্না বর্মন তৈরী করা যায় না, তখন লক্ষ্য করছিলাম স্বপ্নার চোখে সরল খুশির ঝিলিক। অডিটরিয়ামে তখন হাততালির ঝড়।

বিড়ম্বনা, বেশ হিল তোলা জুতো, পরতে কিছুটা কষ্টই হচ্ছিল। তার মধ্যেই স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করলাম 'কেমন লাগছে'? সোনার মেয়ের সোজাসাপটা উত্তর— 'বাপরে, এত লোকজন আমাকে দেখতে চায় ভাবতেই পারি না'। চা নিলাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান কক্ষ তখন কানায় কানায় পূর্ণ।

'সুচেতনা'র পক্ষে স্বপ্নাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বনানী মুখোপাধ্যায়, তিনিই ছিলেন মূল সঞ্চালিকা। কোচবিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডঃ চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় যখন বলেছিলেন মন দিয়ে পড়াশুনো করলে হয়ত একজন উপাচার্য হওয়া যায় কিন্তু মন দিয়ে খেললেই একজন স্বপ্না বর্মন তৈরী করা যায় না, তখন লক্ষ্য করছিলাম স্বপ্নার চোখে সরল খুশির ঝিলিক। অডিটরিয়ামে তখন হাততালির ঝড়। পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় স্বপ্নাকে বাংলার গর্ব বলে ভূষিত করে ২০২০ সালের অলিম্পিকে পদকের প্রত্যাশা করলে দর্শকরা উল্লাস প্রকাশ করে আর স্বপ্নাও হাততালি দিয়ে ওঠে।

বিধায়ক ডঃ সুখবিলাস বর্মা বলছিলেন, একবার স্বপ্না তাঁর কোচ সুভাষ সরকারের সঙ্গে বিধায়কের সল্টলেকের বাড়ি গিয়ে দেখা করেন বিদেশ থেকে স্পোর্টস শু কেনায় সহযোগিতার আবেদন নিয়ে। উনি ওদের কয়েকদিন পরে আসতে বলেছিলেন। পরে স্বপ্না তাঁকে জানান তাঁর জুতোর ব্যবস্থা হয়েছে। এতে মেয়েটির মনের স্বচ্ছতা বোঝা যায়। আবেগাপ্লুত বিধায়ক যখন দেশি ভাষায় মেয়েটির সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখছিলেন তখনও স্বপ্নাকে খুব হাসতে দেখা গেল। একই সারল্যে ডি.পি.রায়কে তাই সহজেই বলতে পারেন 'মোটু মিঠুদা'।

এরপর মঞ্চে উঠে ওকে যখন বোঝালাম ওদের বাড়ির কাছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনটিতে পদাতিক এক্সপ্রেস স্টপেজ চালু করলে জলপাইগুড়ির বহু মানুষের উপকার হবে, তখন শুনেই স্বপ্না বলেছিলেন, 'রেলের বড় সাহেবদের দেখা পেলেই বলব'। মিঠুর সংক্ষিপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যের পর মহেন্দ্র নাহাটার পুরস্কার অর্থ দশ লক্ষ টাকার চেক স্বপ্নার হাতে তুলে দেওয়া হল। এবার স্বপ্না মাইকে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, অলিম্পিকে সোনা জয় খুব কঠিন ব্যাপার তবে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। দর্শককুলের আব্দার রাখতে প্রথমে একটু কুণ্ঠা থাকলেও পরে গলা ছেড়েই দু-চার কলি ভাওয়াইয়া গেয়ে শোনালেন। 'সুচেতনা'র তরুণীদল গানে নাচে মাতিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন, নিজের মাটিতে নিজ সাফল্য উদ্‌যাপনে মেতে উঠতে দেখেছিলাম স্বপ্নাকেও।

মনে পড়ছিল প্রথমদিন সন্ধ্যায় স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে দেখেছিলাম জোনাকির মিছিল। আজ মনে হয়, সে মিছিল হতভাগ্য জলপাইগুড়িকে এইবার বুঝি বা কোনও দিশা দেখাতে চলেছে। যে মিছিলের শেষে আলোকবর্তিকা হাতে দৌড়ে আসছে আমাদের হাসিমুখ ভারতকন্যা স্বপ্না, তার পেছনে যোগ দিয়েছে নতুন প্রজন্মের ডুয়ার্স। উত্তর বাংলায় এবারের দীপান্বিতা উদ্‌যাপিত হবে সেই স্বপ্নালোকে।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

শ্রীমতী ডুয়াস

নারী শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি সময় কাজ করেন। অথচ নারী শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম মজুরি পান। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, শ্রমের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে গভীর বৈষম্য আমাদের সমাজে আজও বিদ্যমান।

ভারতীয় সামাজিক কাঠামোয় ঘরকন্না চালানোর সমস্ত অলিখিত দায়িত্ব যেন মেয়েদেরই ঘাড়ে। তবে দুঃখের কথা, কোনও কালেই মেয়েরা ঘরের কাজের কোনও দাম পাননি। আর সেই মেয়েরাই যখন বাইরের কাজ করেন, যেমন- কলকারখানার কাজ, চাষের কাজ, গৃহ পরিচারিকার কাজ, তখন তাঁদের বলা হয় নারী শ্রমিক। কিন্তু তখনও কি তাঁরা শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পান? সেখানেও দেখা যায় তাঁরা আর্থিক বঞ্চনার শিকার! অথচ ভারতীয় সংবিধান ও বিভিন্ন শ্রম আইনে তাঁদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার কথা ভেবে নানা বিধি ও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করবার কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে নারী শ্রমিকেরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। শোষণের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

আমাদের সংবিধান কি বলে?

লিঙ্গের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না। - অনুচ্ছেদ ১৫(ক)

নারীদের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নারীদের পক্ষে ইতিবাচক বৈষম্য সৃষ্টি করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। - অনুচ্ছেদ ১৫(গ)

রাষ্ট্রের অধীনস্থ কোন কার্যালয় বা চাকরিতে নাগরিকদের নিয়োগ বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনরূপ পৃথকীকরণ করা চলবে না বা অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। - অনুচ্ছেদ ১৬

পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাবে। অর্থাৎ দুজন শ্রমিক, তাঁরা নারী হোক কি পুরুষ, যদি সমান কাজ করেন তাহলে দুজনই সমান মজুরি পাওয়ার অধিকারী। - অনুচ্ছেদ ৩৯ (ঘ)

আমাদের দেশের সংবিধান কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বললেও, পুরুষের সমান কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মহিলারা আজও পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান। তাই কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বেতন কাঠামোতে এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ১৯৭৬ সালে সমবেতন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী, ভারতের সর্বত্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। অর্থাৎ মহিলা বলে কম মজুরি, পুরুষ বলে বেশি মজুরি প্রদান এই আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সমবেতন আইন, ১৯৭৬ কী বলে?

১) একই কাজের জন্য বা একই প্রকৃতির কাজের জন্য নারী ও পুরুষকে সমবেতন দেওয়া নিয়োগকর্তার কর্তব্য — ৪ নং ধারা

২) মহিলা কর্মী নিয়োগের সময়ে শুধুমাত্র লিঙ্গের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ করা চলবে না, যদি না সেই কর্মে নারীদের নিয়োগ আইনত নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ মহিলা কর্মী নিয়োগ এবং নিয়োগ পরবর্তী শর্তাবলী পালনের সময়, যেমন পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ কিংবা বদলির ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা নারী কর্মীদেরও উপযুক্ত ও সমান সুযোগ দেবেন। - ৫ নং ধারা

৩) মহিলা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনটিকে অমান্য করলে, নারী-পুরুষকে সমকাজে সমবেতন না দিলে, কর্মস্থলে নারী পুরুষে পার্থক্য করলে, সরকারী নির্দেশ অমান্য করলে নিয়োগকর্তার নূন্যতম ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা অন্তত তিনমাসের কারাদণ্ড হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থদণ্ড বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং কারাদণ্ড বাড়িয়ে তিন বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে উভয়দণ্ডও হতে পারে। অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। - ১০ নং ধারা

অর্থাৎ সমকাজে সমমর্যাদা ও সমবেতন প্রাপ্তি একটি সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার। তবে দুঃখের বিষয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের, যেমন নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ পরিচারিকা প্রমুখের, ওপর এই আইন প্রযুক্ত হয় না। অথচ সেখানেই বেশিরভাগ নারী শ্রমিকেরা কাজ করেন!

বিগত দশকগুলিতে, ভারতে এমন এক অর্থনৈতিক ও জনতাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা সাধারণত শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগহণের হার বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। ১৯৯০ সালের পরবর্তী দশকগুলিতে যথেষ্ঠ পরিমাণে অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে, প্রজনন হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক নীচু স্তর থেকে উঠে এসে অবিশ্বাস্যরূপে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একই ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নতির ফলে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। তবুও ভারতের ন্যাশনাল সেম্পল সার্ভে রিপোর্ট বলে, ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ২৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সী মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার শহুরে এলাকায় প্রায় ২৬-২৮ শতাংশতে স্থগিত হয়ে রয়েছে, এবং গ্রামাঞ্চলে সেই হার ৫৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে প্রায় ৪৪ শতাংশতে! তাই ভারতের সমস্ত অঞ্চলে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেকারত্ব হার অনেক বেশি।

নারী শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি সময় কাজ করেন। অথচ নারী শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম মজুরি পান। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, শ্রমের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে গভীর বৈষম্য আমাদের সমাজে আজও বিদ্যমান। বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণার ফলে জানা গেছে, অর্থনৈতিক নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে না পারাটাই মহিলাদের সর্বপ্রকার পরাধীনতার মূল কারণ। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করেই সমাজের সর্বস্তরে নারীদের জন্য সমতার কাঠামো গঠন করা সম্ভব। বর্তমানে সারা পৃথিবীজোড়া গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে, নতুন সামাজিক অবস্থা ও ধ্যানধারণার বিষয়ে আইনি ও প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে এবং ন্যায়িক ব্যাখ্যার মাধ্যমে, 'আইন' যে কেবলমাত্র উপস্থিত পরিস্থিতির স্পষ্টীকরণ করে চলেছে তা-ই নয়, সেই সাথে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার পথটিও সুপ্রশস্ত করছে। সৌভাগ্যবশত, আমাদের দেশেও আইন একই ভূমিকা পালন করছে। তাই কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইন সবসময়ই হয়ে উঠতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

রাখি পুরকায়স্থ (আইন বিশেষজ্ঞ)
rakhe.pur@gmail.com

চিকিৎসকের মুখোমুখি

জর্দা পান সুপুরির উত্তর বাংলায় মুখের মারণ রোগ বেড়েই চলেছে

ডা. পরিতোষ হাঁসদা

'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না' কথাটা যে কতখানি সত্যি তা বোধহয় একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। দাঁতের সমস্যায় সংকটে পড়ার পরেই আমরা দন্তচিকিৎসকের কাছে যাই, তার আগে নয়। কিন্তু ততদিনে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দাঁত ততদিনে নষ্ট হয়ে গিয়ে মুখের সৌন্দর্যটাই কোথায় হারিয়ে গেছে। আমাদের গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে পান আর কাঁচা সুপারি এত বেশি মাত্রায় চলে যে সেখানে শুধুমাত্র এই একটা কারণেই এই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভেতর নানান ধরনের রোগ বাসা বাঁধে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলা করায় তা মারণ রোগ হিসেবে দেখা দেয় কিছুদিন পরই। সুপারি দাঁতের পাশাপাশি ভীষণভাবে মাড়ির ক্ষতি করে। এর ফলে মুখে গন্ধ, দাঁত ও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, পাইরিয়া, মুখ গহ্বরে বিভিন্ন ধরনের ঘা এসব এই অঞ্চলে নিত্য দিনের সমস্যা। মুখের সেই ঘা পরবর্তীতে ক্যান্সারের রূপ ধারণ করে। আর মাড়ি ঠিক না থাকলে দাঁত তো কোনওমতেই ঠিক থাকতে পারে না। সেই কারণে উত্তরবঙ্গে ওরাল হেলথ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা ভীষণভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে বলে ভাবছেন উত্তরের দন্তচিকিৎসকরা। কোচবিহারের জেলা হাসপাতালে ডেন্টাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্জন ডা. পরিতোষ হাঁসদার সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনায় উঠে এল এই শঙ্কাজনক তথ্য। গত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তাঁর এই উপলব্ধিটাই বেশি করে হয়েছে বলে মনে করেন ডা. হাঁসদা।

দাঁতের সমস্যা শুরু হওয়ার আগেই ডেন্টিস্টের কাছে আসুন— মানুষকে সচেতন করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন আইডিএ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের উত্তরবঙ্গ শাখার ডাক্তাররা নিজেদের পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে বেরিয়ে পড়ছেন উত্তরের নানা প্রান্তে আয়োজিত সব ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্পে মানুষকে সচেতন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন নর্থ বেঙ্গল লোকাল ব্রাঞ্চ-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডা. পরিতোষ হাঁসদা গত এক বছর নেতৃত্ব দিয়েছেন এই অভিযানের। তিনিই জানালেন, আমাদের উত্তরবঙ্গে মাত্র ২০ বছর ধরে কাজ শুরু হলেও এই সংস্থার জন্ম কিন্তু ১৯৪৬ সালে, এই পশ্চিমবঙ্গে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই। ডা. আর আহমেদের উৎসাহে এবং উদ্যোগে গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম দু'বার তিনিই এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজ্যে এই সংস্থা শাখা বিস্তার করে। ১৯৯৮ সালে এই সংস্থা উত্তরবঙ্গে তাদের শাখা খোলে। সেই থেকে নিরলস ভাবে তাঁরা ওরাল হেলথ নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করে যাচ্ছেন।

মূলতঃ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার আর উত্তর দিনাজপুরের কিছুটা অংশ জুড়ে উত্তরবঙ্গের এই শাখা সংস্থা কাজ করে চলছে। এখন সদস্য ১৫০ জন দাঁতের ডাক্তার। সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড চলে এই সংস্থার। তার মধ্যে একটি হল বিভিন্ন টপিকের উপর এডুকেশনাল প্রোগ্রাম বা শিক্ষামূলক আলোচনা সভা। রাজ্যের বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞরা যেমন আসেন, তেমনি বিদেশ থেকেও বিশেষজ্ঞরা এসে এই কর্মশালায় আলোচনা করেন, মত বিনিময় হয়। এতে সারা বিশ্বে দাঁতের চিকিৎসা নিয়ে কী ধরনের উন্নতি হচ্ছে, নতুন কী পদ্ধতি আবিষ্কার হল সে সব জানা যায়। ডা. হাঁসদার মতে, দাঁতের আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও এধরনের আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের আপগ্রেড করার সুযোগ পাওয়া কম কথা নয়। যেমন গত জুন মাসে কোচবিহারে এইধরণের এডুকেশনাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল। কোরিয়া থেকে বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন।

জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য কী করে থাকেন এই ডাক্তাররা? যেমন প্রত্যন্ত গ্রামে ঢুকে কিছু স্কুল বেছে নিয়ে সেখানে তাঁরা 'স্কুল ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম' করেন। সেখানে বাচ্চাদের ছোট থেকেই কী করে দাঁতের যত্ন নিতে হবে তা শেখানো হয়। ভুল পদ্ধতিতে দাঁত পরিচর্যা করার ফলে বহু মানুষকে দাঁতের রোগের শিকার হতে হয়। কী করে সঠিক পদ্ধতিতে ব্রাশ করতে হয় এসব কর্মশালায় তা দেখানো হয়। সঠিক পদ্ধতিতে ব্রাশ করার মাধ্যমে ৭৫ শতাংশ দাঁতের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে জানালেন ডা. হাঁসদা। শুধুমাত্র ব্রাশ ভালোমত না করার জন্য দাঁতের সাথে মাড়ি সংক্রান্ত ব্যাধিও মারাত্মক হয়। ঠিক মত মুখের যত্ন না নেবার জন্য ৫০ শতাংশ মানুষ মাড়ি সংক্রান্ত সমস্যার শিকার। আর ৪৫ শতাংশ মানুষ দাঁতের রোগের শিকার। এছাড়াও 'কমিউনিটি ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম'-এ ৮ থেকে ৮০ সব বয়সী মানুষ আসে। যেহেতু নর্থ-ইস্ট পান সুপারি গুটকা জর্দা ইত্যাদির স্বর্গরাজ্য, সেই কারণে এদিকেই দাঁত ও মাড়ির রোগ বেশি দেখা যায়। সুপারির থেকে 'ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস' নামে যে রোগ হয়, তা ক্যান্সারের উপসর্গ বলে জানালেন তিনি। চা বাগান, সীমান্তবর্তী দারিদ্র্য অধ্যুষিত এলাকাতে 'কমিউনিটি ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম'-এ সাধ্যমত ওষুধপত্র, মাউথ স্প্রে, মাউথ ওয়াশ, টুথপেস্ট আইডিএ-র পক্ষ থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। গত এক বছরে আইডিএ উত্তরবঙ্গ শাখা আয়োজিত এই ধরণের নানা ক্যাম্পে নানা বয়সের মানুষের যোগদানের সংখ্যা হাজার দেড়েকের বেশি।

দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে সেই দাঁত রাখতে যা খরচ, তার চার ভাগের এক ভাগ খরচে হয় দাঁতটি তুলে ফেলতে। আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বহু মানুষ তাই করে। সময়ের আগে দাঁত হারিয়ে যায়। একটা দাঁত ইমপ্ল্যান্ট করতে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা মত খরচ হয়। রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টও সমান ব্যয়বহুল। যেখানে মানুষ দুবেলা ঠিক মত খেতে পায় না, সেখানে দাঁতের চিকিৎসা করানো একধরনের বিলাসিতা।

ডা. হাঁসদার মতে, দাঁতে কোনও অসুবিধা না থাকলেও আমাদের প্রত্যেকের উচিত ছ'মাস অন্তর দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়মিত পরীক্ষা করানো। এই পিরিওডিকাল চেকআপ চিকিৎসারই অঙ্গ। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের গাইড লাইনেও একথা বলা আছে। এর ফলে ডাক্তারদের পরামর্শ মত সঠিক যত্ন নেওয়ায় দাঁত যেমন ভাল থাকে, তেমনি দাঁতের কোনওরকম সমস্যা হলে তা শুরুতেই ধরা পড়ে। ফলে চিকিৎসারও সুবিধা হয়। দাঁতের চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে সেই দাঁত রাখতে যা খরচ, তার চার ভাগের এক ভাগ খরচে হয় দাঁতটি তুলে ফেলতে। আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বহু মানুষ তাই করে। সময়ের আগে দাঁত হারিয়ে যায়। একটা দাঁত ইমপ্ল্যান্ট করতে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা মত খরচ হয়। রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টও সমান ব্যয়বহুল। যেখানে মানুষ দুবেলা ঠিক মত খেতে পায় না, সেখানে দাঁতের চিকিৎসা করানো একধরনের বিলাসিতা। শুধুমাত্র সচেতনতা থেকে আমরা দাঁতের এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

কিন্তু মানুষ এখনও বহু ক্ষেত্রে পুরনো ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, আক্ষেপের সুরে স্বীকার করলেন ডা. হাঁসদা। তাঁর মতে, আর্থ সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকাও অবশ্য এজন্য খানিকটা দায়ি। গ্রামে এখনও দাঁত ব্যথা হলে ঝাড়ফুঁক করে। মন্ত্র দিয়ে দাঁতের পোকা ফেলা হয়। এসব প্রথা আজও চলছে সমান তালে। আরও মারাত্মক যে জিনিসটা করা হয় তা হল, কোয়াক বা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া। কোয়াক ডাক্তারেরা যেভাবে অস্ত্রোপচার করে থাকে তাতে রুগীর জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এত বছর সরকারি চাকুরি করার সুবাদে বিশাল অভিজ্ঞতার ঝুলি সঞ্চয় করেছেন ডা. হাঁসদা। রোজ প্রচুর রুগী নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, দাঁত-এর সমস্যায় আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এক কোচবিহার জেলা হাসপাতালেই পাঁচ বছর আগে যেখানে রুগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১২৫০০, সেখানে ২০১৭ তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৬৬০।

ডা. হাঁসদার বক্তব্য, দাঁত মানুষের সৌন্দর্যের প্রতীক। ঝকঝকে দাঁত সকলেরই কাম্য। একটা সুন্দর হাসি যে কোনও মানুষের মন ভাল করে দিতে সক্ষম। সে জন্য প্রথম থেকেই দাঁতের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আজকাল মাড়ি উঁচু, দাঁত উঁচু, ফাঁকা ফাঁকা দাঁত এসব সমস্যা কোনও সমস্যাই নয়। দাঁতের চিকিৎসা এখন এতটাই উন্নত হয়ে গিয়েছে, যে এ ধরনের সবকিছুরই সমাধান করা যায়। কিন্তু সচেতনতার অভাবে মানুষ নিজেদের যে ধরনের ক্ষতি করে নিয়ে আসে তার সমাধান সূত্র মেলা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই হার্ট-পেট-চোখ ইত্যাদির পাশাপাশি আমাদের দাঁতের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও সমান মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কম বয়সে দাঁত নষ্ট হয়ে সৌন্দর্য হারাবার ভয় কার না থাকে?

ইন্টারনেটের যুগে যেখানে হাতে হাতে স্মার্ট ফোনে এধরনের ডাক্তারি পরামর্শ এক আঙুলের স্পর্শে মেলে, সেখানে বেশিরভাগ মানুষেরই দাঁত সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বিস্ময় জাগায়, ডাক্তারবাবুর মত আমাদেরও। দাঁত বা মাড়ির সমস্যা শুধু মুখেই থেমে থাকে না। এ থেকে পেটের গন্ডগোল, হজমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। আর ওরাল ক্যান্সার আজকাল এত বেশি পরিমাণে হচ্ছে, যা মানুষকে অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এতসব সত্ত্বেও আশার আলো মেলে ডা. পরিতোষ হাঁসদার শেষ বাক্যগুলিতে— 'ভরসার কথা হল জনসচেতনতা ক্যাম্পে মানুষ আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছেন, নানা প্রশ্ন করছেন, হয়ত নিজেদের ছেলেমেয়েদের সুস্থ জীবনের কথা ভেবেই'। আর ডেন্টাল সার্জারিতেও পাশ করে বেরিয়ে আসছে যে নতুন প্রজন্ম তারাও যথেষ্ট 'প্রমিসিং' বলে মনে করেন ডাক্তারবাবু, হাসপাতালের আউটডোরে বা বাইরের ক্যাম্পগুলিতে তাদের বিপুল উৎসাহে যোগদান দেখলে মনে বিশ্বাস জাগে, আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতির বদল হবেই।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

আজকাল মাড়ি উঁচু, দাঁত উঁচু, ফাঁকা ফাঁকা দাঁত এসব সমস্যা কোনও সমস্যাই নয়। দাঁতের চিকিৎসা এখন এতটাই উন্নত হয়ে গিয়েছে, যে এ ধরনের সবকিছুরই সমাধান করা যায়। কিন্তু সচেতনতার অভাবে মানুষ নিজেদের যে ধরনের ক্ষতি করে নিয়ে আসে তার সমাধান সূত্র মেলা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই হার্ট-পেট-চোখ ইত্যাদির পাশাপাশি আমাদের দাঁতের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও সমান মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কম বয়সে দাঁত নষ্ট হয়ে সৌন্দর্য হারাবার ভয় কার না থাকে?

দাঁত রক্ষার 'বিরাশি' ছক্কা

এক। রাতে শোবার আগে অবশ্যই ব্রাশ করতে হবে

দুই। খাবার কিছুক্ষণ পর ব্রাশ করা উচিত

তিন। সকালে খালি পেটে ব্রাশ করা ঠিক নয়

চার। খুব জোরে জোরে দাঁত মাজা কখনই উচিত নয়

পাঁচ। একটা ব্রাশ আড়াই মাসের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়

ছয়। ব্রাশ দিয়েই জিভ পরিষ্কার করা উচিত, জিভ ছোলা ব্যবহার করা ঠিক নয়

ধারাবাহিক কাহিনি। ৫

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

অরুণ নামের বিদ্রোহী, রাজনীতি করা ছেলেটা সম্রাজ্ঞীর মনের দুরূহ কোনো এক কোনটুকুতে জায়গা করে নিয়েছিল। অরুণও বোধহয় ভাবতে শুরু করেছিল সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে, কিন্তু মুখোমুখি হল যখন, সম্রাজ্ঞী পড়ে নিল ওর প্রথম স্বপ্নপুরুষ তাকে নিয়ে কোন ইমারতের সূচনাই করে নি। বরং বাস্তববাদী অরুণের এ উন্নাসিক উদাসীনতাকে প্রশ্রয় দিতে চায় নি সম্রাজ্ঞী। ফিরে গেছে। মনের মেঘের ছায়াটুকু সরাতে চায়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল শিক্ষা শেষ করার পর নৃপেন্দ্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে থাকেন তাঁরা। কিন্তু বাদ সাধলেন রাজমাতা। প্রথমত কালাপানি পারের ভয়, দ্বিতীয়ত সেখানে না জানি কোন মেমসাহেবের পাল্লায় পড়ে যাবে! আর জাত খোয়াবে, এই আশঙ্কায় নিশিময়ী ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে চাইলেন না।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পের দৌত্যে ঠিক হয় বিয়ে করে তারপরই রাজা পাড়ি দেবেন সমুদ্র। নৃপেন্দ্রনারায়ণের উপযুক্ত পাত্রী খোঁজার ভার দেওয়া হল রাজ কর্মচারী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীকে। কেশবচন্দ্রের শিষ্যা রেভারেন্ড প্রসন্নকুমার সেনের পরামর্শে মহারাজের জন্য পাত্রী মনোনীত করলেন সুনীতিকে। ব্রিটিশ সরকারের খুব পছন্দ হল এ প্রস্তাব। তাঁরা চেয়েছিলেন, কেশবচন্দ্রের হাতে পড়ে কোচবিহারের রূপ হোক নতুন, আধুনিক।

সে আধুনিক কোচবিহারের কথা মনে হতেই সম্রাজ্ঞীর চোখে ভাসে একটি বই,'আ অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস' খুঁজতে গিয়ে এ তাক ও তাক, খসখস শব্দে সোহাগিনী কিংবা রাজীব ঠিক একবার জিজ্ঞেস করবেনই— কি হল রানি? ঘুমোসনি এখনও?

আবার সন্তর্পণে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় হাতের কাছে সুনীতির আত্মজীবনী। সেখানে উল্লেখ তো আছেই, সুনীতির বিয়ের প্রস্তাব কেশবচন্দ্র বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা সত্ত্বেও সরকার ও কোচবিহার রাজ্যের প্রতিনিধিরা বারবার চিঠি পত্রের মাধ্যমে, দেখা সাক্ষাৎ করে খবর পাঠিয়ে সে প্রস্তাব গ্রহণ করার অনুরোধ জানাতে থাকেন।

মানুষ তো! বার বার অনুরোধে নিমরাজি হলেন, তবু শর্ত দিলেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক এই বিয়েতে কোনও অনুষ্ঠান হবে না, কেবল ঘটবে বাগদান পর্ব। নৃপেন্দ্র নারায়ণ লন্ডন থেকে ফিরলে পাত্র পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিবাহ অনুষ্ঠানের কোনও বাধাই থাকবে না। মহারাজের কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতিও চাইলেন, তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী হবেন এবং বহু বিবাহ করবেন না। আর এ বিবাহে কেশবচন্দ্র নিজে কন্যা সম্প্রদান করবেন না, করবেন অন্য একজন আত্মীয়।

ছবিগুলো মহারাণীর অন্ধকার ঘরে। চলচ্চিত্রের মত শুধু পর পর আসে আর চলে যায়। ঠিক যেমন খুব ছোট্টবেলায় বাজনা বাজিয়ে টিনের এক বাক্সে চোখ লাগিয়ে চলচ্চিত্রের স্থির ছবি পর পর দেখে যেত শিবুকাকার কাছে। বন্ধুরা মিলে শিবুকাকার বানানো যন্ত্রটায়। চলচ্চিত্রের মানুষগুলোকে বন্দী করে রেখে দিয়েছে এ বিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত ছিল মহারানী আর ওর বন্ধুদের। ভারী মজার বিশ্বাস! টুকরো ছোটবেলাগুলো জুড়ে জুড়ে ইতিহাস। এই যে আজ রাতের না ঘুমোনোর পিছনে ঘনিয়ে তোলা পরিস্থিতি! এতে কি মহারাণীর একটু হলেও সম্মতি কাজ করেনি? করেছে তো। নিজের উপর বেজায় রাগ হতে থাকে। অরুণটা এমন কে, ওকে নিয়ে এত ভাবছেই বা কেন রাণী! সত্যিই তো আর সুনীতির মত চোদ্দো বছর নয় ওর। তখন থেকেই তাকে ভাবতে হয়েছে, স্বামী আমি তোমার... আর তখন থেকেই প্রেম। আহা! এমন প্রেম নিকষিত হেম যেন। বাইরে গিয়েও সমস্ত জটিল পরিস্থিতি একাই সামলেছেন নৃপেন্দ্র নারায়ণ। পরিস্থিতি তো জটিল থেকে ঘোরতর জটিল আকার নিয়েছিল যখন রাজবাড়ীর লোকজন কেশবচন্দ্রের শর্তগুলো উপেক্ষা করতে আরম্ভ করে। গোঁড়া হিন্দু রক্ষণশীল পরিবার, চরম কুসংস্কারাগ্রস্ত, তারা প্রগতিশীল ব্রাহ্মবিবাহ মেনে নেবেন কী করে! নৃপেন্দ্র নারায়ণের মা নিশিময়ী ঘোষণা করে দিলেন, হিন্দু প্রথা অনুযায়ী বিয়ে না হলে সুনীতির মহারানী হওয়া কিছুতেই হবে না। সমস্ত জটিলতার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে উষ্ণ আলোর স্রোতের মত, একবগ্গা হরিণের মত পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন নৃপেন্দ্র নারায়ণ। ঘোষণাই করে দেন এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলে জীবনে আর কাউকে বিয়ে করবেন না। আর ঘোড়া প্রস্তুত, যেদিকে খুশি চলে যাবেন। সুতরাং ১৮৭৮-এর মার্চ মাসের একেবারে প্রথম সপ্তাহেই বাগদান পর্ব শেষ হয়।

এই পুরো ছবিটা মেলাতে পারে মহারাণী, প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে বুকের পাশে, আচ্ছা, অরুণের মধ্যে সেরকম বলিষ্ঠ কিছু আশা করছে কি মহারাণী মনে মনে, সঙ্গে সঙ্গেই বুক খালি করে অট্টহাস্য করতে ইচ্ছে হয়, ধুর ওসব স্বপ্নে হয়, আর ইতিহাসও একবারই লেখা হয়।

মাথা থেকে ওসব তুলে রেখে ঘুমোবে বলে মহারাণী উঠে পড়ে। যত্নে তাকে তুলে রাখে বই। বাকিটা কাল দেখবে। বন্ধ বাথরুমে পাশের ঘর থেকে জলের আওয়াজ পায়। জানে রাণীও না ঘুমোলে ওরাও জেগে থাকে। কী করে টের পায়! বাবা মার মত এত বুঝে নেবে রাণীকে আর কে হবে! বুকের ভেতর শূন্যতা হা হা করে, যখনই ভাবে এ ঘর ছেড়ে একদিন যেতে হবে, চলে যেতে হয়। সে কি দৃঢ়! দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার সাধ্য কী তার। ঘাড়ে মাথায় জল দেয়, অস্থিরতা কমিয়ে নিতে চেষ্টা করে, চোখ বোজে রাণী। ধূসর মেঘ রঙা আকাশের মধ্যতলে তখন অস্পষ্ট চাঁদ।

৮

পশ্চিমের তারা ফোটা রাত। প্রবল প্রতীক্ষা, একলা কোনও কিশোরীর নারী হয়ে ওঠা। বাইরে সমাজ জুড়ে প্রবল দ্বন্দ্ব। পিতার এক কালের অনুরাগী জনেরা কেশব বিরোধী দলে এখন। তার মনের টানাপোড়েনের শব্দগুলো কীভাবে প্রকাশ করবে সে, খাতার পৃষ্ঠায় জমতে থাকে মনের অনুভূতিগুলো। সে বাগদানের রাত যতই বিভীষিকা হোক ছায়ার মত সে পুরুষের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তার সামনে। পিতার পাশে সে অল্পবয়সী যুবকের মুখ নিয়তই এসে দাঁড়ায় সুনীতির শিয়রের কাছে, লেখার পড়াশুনোর শব্দমালার পাশে।

সেই ইতালীয়ান, কোরেন্থিয়ান স্থাপত্যের রাজপ্রাসাদ স্বপ্নের মত আবছায়া শীতের সরের মত মনের ভিতর আসা যাওয়া করে। না, সংশয় নেই কোন। সেই যে অলক্ষে হাতের আঙুলে লেগেছিল স্পষ্ট পুরুষালি চাপ, শিহরণ জেগেছিল। প্রতিজ্ঞা ছিল 'আমি আসবই'।

ব্রাহ্ম সমাজে ফাটল ধরলেও ১৮৮০র ২০শে অক্টোবর দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীর একত্র সম্মিলন ঘটেছিল। সুনীতির প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছিল। রাজনগরও আলো হয়ে উঠেছিল কোণে কোণে। কুসংস্কারের সমস্ত বাতাবরণ তো দূর হবেই, হতেই হবে এইবার। এ শহর তখন রাজ্য, পরিপূর্ণ আধুনিকীকরণ ঘটে গিয়েছিল, যা সে সময় অকল্পনীয়। ব্রহ্ম প্রভাব পড়ে সে পুরুষের আগমনে। তাঁর রাজ্য শাসনে। সুনীতির পদচারনার বিস্তৃতি ঘটে ঠিক সে সময়। আধুনিক কোচবিহারের রূপকার যে তার হাত ধরে আছেন।

এরকম দুই পরিবারের সু সম্মিলনের পরবর্তী ধারায় রাজ পরিবারের বহু বিবাহ চিরতরে দূরে চলে যায়। রাজ প্রাসাদের অজস্র পরিচারক পরিচারিকার আলোড়ন কোলাহলেও রান্নাঘরের সুবিন্যস্ত পারিপাট্য ফিরিয়ে এনেছিলেন মহিষী সুনীতি। ঘরে বাইরে এ কোন কন্যে থেকে মহারাণী ছড়িয়ে পড়েছেন সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বর্তমানের ধূলোবালির আঁচলে।

***

কলেজের শেষ বছরের সেমিনার। সম্রাজ্ঞী এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ সম্পর্কে তার বক্তব্যে বেশ ক'টা স্মরণযোগ্য অংশে মহারাজার কাজ সম্পর্কে তুলে ধরেছে। সে সময়ের আধুনিকতার রূপকার কোচবিহারকে কীভাবে আধুনিক ভাবনায় জারিত করেছিলেন সে তো এখানকার রেল পথের বিস্তৃতি, কলেজ বিদ্যালয় স্থাপন, নারী স্বাধীনতা, সাহিত্যচর্চার মধ্যেই উঠে এসেছে। কোচবিহার স্টেটের আয়কেও যে তিনি কতটা বাড়িয়েছিলেন সেকথাও আজ বলতে পেরে, সামনে বসে থাকা অতিথি আসনের প্রতিটি উজ্জ্বল মুখ সম্রাজ্ঞীকে আরও খানিকটা প্রাণিত করেছিল।

বয়স্ক মানুষের মুখে প্রজাবৎসল দয়াবান রাজার কথা আর সুনীতি দেবীর উদারনীতি, তার কাজকর্মের কথা এখনও ঘুরে ফিরে উঠে আসে। "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম..." এ গানের বাস্তব প্রেক্ষিত বোধহয় কোচবিহারের রাজ আমলের ক্ষেত্রেই খাটে। মানুষ সত্যিই ভাল থাকত, ভালভাবে বাঁচতে শিখেছিল।

—এই রানি, আজ কিন্তু তুমি খুব ভাল বলেছ। আসলে জন্মশহরকে ভালবাস বলেই বোধহয় আরও বেশী প্রেরণা পেয়েছ।

—না, যেটা বাস্তব সেটাই বলেছি। সে সময়টা তো আমি দেখিনি। ছোটবেলায় শুনেছি বাবার মুখে, ঠাকুমার মুখে, তারপর খুঁটিয়ে জানার ইচ্ছে হল, আর এত অদ্ভুত আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, সেও তো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু তার আমলেই। ঘুরে ফিরে তাঁর কথাই বলতে ইচ্ছে করে।

—আর যোগ্যা সহধর্মিনী পেয়েছিলেন বটে!

ঘুরে তাকিয়েছিলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি। এখানে যাঁরা অধ্যাপনায় আসেন, প্রথম দিকে স্থানীয় হলেও এখন নিয়ম করে পিএসসি নির্বাচন করে পাঠায়। এখানে যাঁরা অধ্যাপনায় আসেন প্রায় সকলেই দক্ষিণবঙ্গের। পিএসসি মারফৎ যোগ দিয়েছেন কাজে। আর রাজবাড়ি সম্পর্কে আগ্রহী হন না এমন অধ্যাপক কমই এখানে। সাগর দিঘি, শহীদবাগ এসব সম্পর্কে আগ্রহ দেখান এঁরা আর সম্রাজ্ঞীর বলতে ভাল লাগে, গর্ব হয়। এ চারণ ভূমিতেই বেড়ে ওঠা, বই পড়া, বাবার সান্নিধ্যে মানুষ হওয়া, অধ্যাপকের স্নেহ ছায়া মহারাণীর উপর আছে, নিশ্চিন্ত হন রাজীব মিত্র আর সোহাগিনী।

রাজীবের প্রিয় স্কুল জেঙ্কিন্সের পাশেই এ কলেজ। তখনকার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া। তাঁর প্রিয় কলেজ ছেড়ে একদিন তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে। ছাত্র আন্দোলনে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সিআরপিএফ-এর গুলি গোলা ও বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদী ছাত্রনেতার নামে অভিযোগ ওঠে। কলেজ কর্তৃপক্ষই তাড়ান রাজীব মিত্রকে। সঙ্গে আরও এক ছাত্রনেতাকে। এসব এখন গল্পকথা। রাজীব হাসিমুখে এসব কথা মেয়ের কাছে বলেন ঠিকই, মহারাণী টের পায় বাবার যন্ত্রণাগুলো, মনে মনে বলে, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে তোমার কন্যে, তুমি দেখে নিও। রাজীবের যন্ত্রণা তখন

ব্রাহ্ম সমাজে ফাটল ধরলেও ১৮৮০র ২০শে অক্টোবর দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীর একত্র সম্মিলন ঘটেছিল। সুনীতির প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছিল। রাজনগরও আলো হয়ে উঠেছিল কোণে কোণে। কুসংস্কারের সমস্ত বাতাবরণ তো দূর হবেই, হতেই হবে এইবার। এ শহর তখন রাজ্য, পরিপূর্ণ আধুনিকীকরণ ঘটে গিয়েছিল, যা সে সময় অকল্পনীয়। ব্রহ্ম প্রভাব পড়ে সে পুরুষের আগমনে। তাঁর রাজ্য শাসনে। সুনীতির পদচারনার বিস্তৃতি ঘটে ঠিক সে সময়। আধুনিক কোচবিহারের রূপকার যে তার হাত ধরে আছেন।

রাণীর চোখে জলের আগুন।

পরিবারের জন্য রাজীব মিত্র পড়াশুনো অর্ধপথেই ক্ষান্ত দিয়ে কোচবিহারে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তারপর তো আর এক জীবন পর্ব। চাকরি নিয়ে নেওয়া, স্কুল, স্কুল মাস্টারি ছেড়ে মনের মত অফিস সন্ধান। সেখানে কতদিন আধিকারিক থেকে পরিশ্রম আর পরিশ্রমের পর অবসর নেওয়া। সত্যি কাজ বটে! সততার পরাকাষ্ঠা থেকে, শেষ পর্যন্ত এ অজাতশত্রু নিজের জন্য কিছুই করতে পারেন নি। মহারাণী জানে, সোহাগিনীর অসুস্থ হয়ে যাওয়া রাজীবকে যেমন এ পরিবারকেও কুরে কুরে খেয়েছে।

আসলে পরিবার আগলাতে আর সামলে রাখতে রাজীবের জুড়ি নেই। ভাবতে হয় না সম্রাজ্ঞীর। সেও রাণীর মতই মাথা উঁচু করে থাকে, কাজ করে অফুরন্ত মনের জোরে। পিছনে প্রেরণা তার প্রিয় স্কুল আর স্কুল প্রতিষ্ঠাত্রী সুনীতি দেবী।

পড়া পড়া আর লেখা, নোটস নেওয়া আর মাঝে মাঝে এদিক ওদিক অনুষ্ঠান বাবার আগ্রহে, ছোটদের নিয়ে নাটকের দল গড়া, বিভিন্ন বিশেষ দিনে অনুষ্ঠান সবটা এমনকী বাড়িটাই ওর ভিতরে বসে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকী চলতি পথের মানুষেরাও সঙ্গী। অতীত ধরে নাড়াচাড়া দেওয়া, মূল ভিত্তি ভূমির রূপকার ওর সঙ্গে চলে। সঙ্গের যারা বন্ধু বা ভালবাসার টুপটাপ জল ভরে দেয় যারা তাদের কথা ভাবতে গেলেই অরুণের মুখ মনে পড়ে। সে তো পাস টাস করে বহাল তবিয়তে তার পার্টির জন্য প্রাণ দেওয়া নেওয়া করছে আর এখানে ওখানে সেখানে নাটক কিংবা অনুষ্ঠানগুলোয় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। বন্ধুরাই কানের কাছে এসে ফিসফাস বলে যায়। এখন এসব ভাবার অবসর কোথায় রাণীর? চোখে যে অনেক স্বপ্নের ঘোরাফেরা।

সেদিন ফিজিক্স ল্যাবে মঞ্জিল, নিরূপা মঞ্জিষ্ঠা ওরা কিছুতেই ড অচিন্ত্যক পালের পড়িয়ে যাওয়া রিলেটিভিটি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির নানা ইকুয়েশন, ফিজিক্সের প্রতিসরণ, প্রতিফলন, তার সূচক নির্ণয়... এসব নিয়ে আলোচনায় ডুবে থাকার পর সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে পড়েছে আবার।

—নে আর কতক্ষণ কাটাবি, এবার তোর নিজের ইকুয়েশন নিয়ে ভাব। জীবনের ইকুয়েশন আমরা তো সব ভেবে ফেলছি, নাকি অরুণদার মুখ জপ করেই কাটিয়ে দিবি?

এবার হাল ছাড়ে সম্রাজ্ঞী। খাতাপত্র সব গুটিয়ে রাখে। সবার সঙ্গে হালকা চালে গল্পে যোগ দেয়। হৈ হৈ করে... চল চল।

—আরে বন্ধু কথা ঘুরিয়ে দিচ্ছিস? তোর আইডল মহারাণী সুনীতিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালবাসায় থেকে গেছিলেন, আর তুলতুলে পাখিটি হয়েছিলেন মহারাজের। আর দুজনে মিলে কত কী করেছেন দেখেছিস? এই যে কলেজের রাজকীয় প্যাটার্নের বিল্ডিং যা দেখতে আসেন টুরিষ্ট দল, এর ছোঁয়া পেতেও চান এদেশ কেন বিদেশীরাও, সেই কলেজের প্রতি ইটে রাজবাড়ির লাল ইট আর তার আলো।

এবার উজ্জ্বল সম্রাজ্ঞীর মুখ। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। জন্মে ঠিকঠাক কাজের মধ্য দিয়ে দাগ রেখে গেছেন দুজনেই। আর দেখ, মাঝে মাঝে ভাবি ওই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজবাড়ীর মোড়কটাই বদলে দিয়েছিলেন সুনীতি। কত আর বয়স তখন, কী অসীম সাহসী হয়ে রাজ পরিবারে প্রচলিত 'রুদালি প্রথা' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টাকার বিনিময়ে এ কুৎসিত ঘৃণ্য বৃত্তি তিনি মেনে নিতেই পারেন নি। এসব পরিবর্তন তো আর খুব সহজ ভাবে করতে পারেন নি তিনি, রাজপরিবারের বহু প্রাচীনপন্থীরা কত না বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন কিন্তু মহারাণী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যা ভেবেছেন করেছেন। মঞ্জিষ্ঠা বলে ওঠে, পেরেছেন কি এমনি? সঙ্গে তো ছিল বড় সাপোর্ট, তাই না? সেটা ক'জন পায় বল?

কাঁধের কালো ব্যাগ থেকে মলাট দেওয়া বইটা বের করে সম্রাজ্ঞী। দেখ,অটোবায়োগ্রাফিতে উনি নিজেই লিখছেন,"...after my return I resumed my life at lily college like an unmarried girl and was not sorry to forget the strenuous days at Cooch Behar..

I used to get up quite early, and take my bath, for I attended to our prayer-room. কী নিয়মবদ্ধ জীবন পালন করেছেন, লেখাপড়াও সেই সঙ্গে টানা চলেছে। এই ডেইলি রুটিন পড়াশুনো তার মধ্যে লিখছেন, শোন,"..I corresponded frequently with my husband (Nripendra Narayan) in English, his letters were full of cheery accounts of his visit, and his

wish to see me again..”

১৮৭৯ তে নৃপেন্দ্র নারায়ণ ফেরেন ভারতবর্ষে। ওই বছরই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আর থিয়েটার রোডের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন। সুনীতি দেবীর কলমে ফুটে উঠেছে আন্তরিক এক কিশোরির আনন্দিত ছবি। “...my husband's stay in Calcutta was a time of great happiness for me...” কী সহজ মনে বলে গেছেন, ফিরে তাকিয়েছেন।

অচিন্ত্যক স্যারের কাছে এ বই ছিল, উনি ফেরত দিলেন আজ। মঞ্জিল তখন বলছে, আর ঠিক এরপরই তো মানে ১৮৮০তেই তো কোচবিহারে ফেরেন তাঁরা?

সম্রাজ্ঞী যোগ দেয়, হ্যাঁ। ১৮৮০তেই তো ভারতীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে তাঁদের বিয়ের পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান শেষ হয়। জানিস, স্যার বলছিলেন, উনি তো কোচবিহারের ইতিহাস তেমন করে জানতেন না। এখানে এসেছেন প্রায় পাঁচ বছর। ভিক্টোরিয়া কলেজ, এখানকার আমাদের এবিএন শীল কলেজের রূপকারের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কত পড়াশুনো করছেন।

৯

বাড়ি ফিরতেই বাবাকে নিয়ে পড়ল রাণী। রাজীবের এ্যাসিডিটি একটু বেশিমাত্রায়, তবে রাজীবের দাদার ছেলেরা কাকামণি বলতে অজ্ঞান। তাই মহারাণী খানিকটা নিশ্চিন্ত বাইরের কাজ, পড়াশুনো এসব করতে পারে। ঘরে ঢোকার আগেই ডাক্তার কাকুর গাড়িটা চোখে পড়েছিল। ব্যাপার কী! বুকের ভিতর ভয় তো বাসা বেঁধেই থাকে এখন। বয়স তো হয়েছে বাবা মা দুজনেরই। ওদের ছাড়া সব অন্ধকার মনে হয়। ঠাম্মার চলে যাওয়া মহারাণীর প্রথম মৃত্যু দর্শন আর জ্যেঠুমণির চলে যাওয়া সেটা বোধহয় দ্বিতীয় মৃত্যু। জ্যেঠিমার কাতর যন্ত্রণার মুখ কেটে বসে গেছে বুকের ভেতর। তারপর পৃথক অন্ন ভাগাভাগি সব উঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবা রাজীব।

—না বৌদি, সবাই একসাথে আমরা। কোনও আলাদা উনুন নয়। আমি থাকতে কোনও চিন্তা নেই। এই শব্দ টুকরোগুলো বৌদি শোভার মুখে আলো হয়ে থাকে আজও। রাণী তখন ছোট্টটি হয়েও দাগ বা ক্ষতরেখার মত মনে রেখেছে সবটুকু। রাজীব তো মাঝে মাঝেই বলে, রাজার দেশের মানুষ আমরা, আমাদের মহারাজ মানুষের রাজা। আমরা কেউ আলাদা নই। বাড়ির সবদিকে খুঁটিয়ে নজর রাখা রাজীবের প্রতিদিনের সৃষ্টিশীলতায় অক্সিজেন যোগায়। ওর কর্মক্ষেত্র, ক্লাব, অনুষ্ঠান সব তরতরিয়ে চলে। এই তাজা যাট ছুঁই ছুঁই যুবকের আবার কী গড়বড় হল! ছুটতে ছুটতে অজস্র উদ্বেগ নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে স্যালাইন চলছে বাবার। দাদারা ঘিরে বসে আছে, মা রান্নাঘরে খুটখাট।

কী হল মা? সকালে তো সামান্য অ্যাসিডিটি দেখে গেলাম, আর অ্যান্টাসিড তো সঙ্গে সঙ্গে মুখে দেওয়া বাবার স্বভাব। তাহলে? কী হল? এখন কেমন আছে?

সোহাগিনী মাথা নাড়ে। হুম একচোট গেল রে! কী যে মাথা ঘুরছিল ওর। শেষে শ্যামল, টুটুন ওরা এসে ধরে রাখতে পারে না। প্রেসারও ফল করেছে। সেই রাত থেকে পেটে তো কিচ্ছু নেই। সব বমি হয়ে গেছে। তাই ডাক্তারদা স্যালাইন দিয়েছেন। একটু পরই বেরিয়ে যাবেন, তাই চা করছি।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

স্কেচ দেবাশিস সাহা

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করাই আসল কাজ!

দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতের অরণ্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করছেন সৌম্যদীপ দত্ত ও তাঁদের সংস্থা নেচার্স বেকন। এখন আসামের সরকারি উদ্যোগেও তাঁদের সংরক্ষণ ভাবনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সৌম্যদীপের কথায়, মানুষকে সচেতন করাই সংরক্ষণবাদীদের মূল কাজ। বাস্তুতন্ত্রে প্রতিটি প্রাণীর নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, যে কোনও একটির অভাব বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে। অথচ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ও যাচ্ছে বহু প্রজাতির পাখি, পোকামাকড়, মাছ ও নানা জলচর, মেরুদণ্ডী ও সরীসৃপ। অতএব বাস্তুতন্ত্র কতটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সৌম্যদীপ মনে করেন, আমরা যারা প্রকৃতির ভারসাম্য নিয়ে সামান্য হলেও চিন্তা ভাবনা করি তাদের দলবেঁধে পৌঁছতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে, বন লাগোয়া গ্রামে, ইকো রিসর্টে। গিয়ে তাদের ক্রমাগত বোঝাতে হবে, বন্যপ্রাণকে যত কম বিরক্ত করা যায়, তাদের জীবনযাত্রা চলাফেরায় যতটা সম্ভব কম বিঘ্ন ঘটানো যায় বা চোরাশিকার ও পাচার প্রতিরোধ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবেই নিজেদের আগামী প্রজন্মকে সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে, তবেই পর্যটনের ব্যবসা ও কর্মসংস্থান দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বন্যপ্রাণ সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসেবে নেটিভ ইকো সাস্টেনেবল টুরিজম সোসাইটির আয়োজনে জলপাইগুড়ির আড্ডাঘর-এ ২রা থেকে ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় চলল বন্যপ্রাণ নিয়ে বিশেষ ছবির প্রদর্শনী। জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন ও আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের বাছাই করা ছবি নিয়ে ছিল এই প্রদর্শনী। ৬ অক্টোবর দুপুরে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ‘কৃষ্টি’ অডিটোরিয়ামে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে বক্তব্য রাখলেন সৌম্যদীপ দত্ত। দর্শকাসন ভর্তি ছিল স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের উৎসাহী উপস্থিতিতে, মঞ্চে সৌম্যদীপের সঙ্গে ছিলেন স্কুলের শিক্ষক কৌশিক শিকদার ও আয়োজক সংস্থার স্থানীয় সভাপতি প্রশান্ত নাথ চৌধুরী।

সৌম্যদীপ আগাগোড়াই যেটা বলে আসছেন সর্বত্র তা হল, বন্যপ্রাণ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতার কাজে আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কোমল মনের সুকুমার বৃত্তিতে এই সচেতনতার পাঠ অনেক বেশি কার্যকরী হয় বলেই মনে করেন তিনি। তারাই আগামী দিনের সমাজ পরিচালনা করবেন, ছোট থেকে তাদের মনে যে ভাবনা গেঁথে যায় তারই প্রতিফলন ঘটবে সেই সময়। তবে ঘরে বসে কেবল সেমিনার বা প্রদর্শনী নয়, সচেতনতার কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে তাদেরকে জঙ্গলে যেতে হবে বারবার। প্রকৃতির নানা সৃষ্টিকে কাছ থেকে না দেখলে, পাখি পতঙ্গ গাছ এসব না চিনলে বন্যপ্রাণ নিয়ে তাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে না। পুঁথিগত শিক্ষা তাদের প্রতিযোগিতায় উতরে দেয় ঠিকই, কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষাই তাদের জীবনযুদ্ধে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে শেখায়, নিজের চারপাশটাকে নিয়ে ভাবতে শেখে তারা। তাই বছরে এক দু'বার ক্যাম্প করতে, প্রকৃতি পাঠের শিবিরে জঙ্গলে যেতেই হবে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে। সেদিন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ধরে চলে এই আলোচনা সভা। ছাত্রদের নানা ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেন সৌম্যদীপ। উদ্দীপিত ছাত্ররা সবাই হাত তুলে বলে তারা সবাই জঙ্গলে যেতে চায়।

সেদিনই সন্ধ্যায় আড্ডাঘর হলে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গেও আড্ডায় বসেছিলেন সৌম্যদীপ। আলোচ্য বিষয় ছিল “বন্য প্রাণের ছবি তুলে আদৌ কার কী লাভ হয়? এতে মানুষের মধ্যে কতটা সচেতনতা বাড়ে?” ফোটোগ্রাফাররা অভিযোগ তুললেন, তাদের ন্যাশনাল পার্কে ঢুকে ছবি তুলতে খুব একটা উৎসাহিত করে না বন দপ্তর, বরং নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে। উত্তরে সৌম্যদীপ বললেন, যদিও সরকারি লিখিত নির্দেশ ছাড়া এ ধরণে বাধা দেওয়া যায় না, কিন্তু একজন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফারকে কেবল ফোটোগ্রাফার হলেই চলবে না, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেও তাকে নিয়মিত নিজেদের সাধ্যমত কাজকর্ম করতে হবে। যেমন ছবি তুলে জঙ্গলের আশপাশের গ্রামীণ স্কুলগুলিতে বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনী করতে পারেন তাঁরা, এতে ক্ষুদেদের যেমন বন্যপ্রাণ সচেতনতা বাড়বে, তেমনই বনবস্তির মানুষরাও তাঁদের শুভানুধ্যায়ী ভাবতে শুরু করবে। বন দপ্তরের কর্মীরাও যখন দেখবেন ফোটোগ্রাফাররা নিঃস্বার্থভাবে জঙ্গলে কাজ করছে, তখন তাদের সঙ্গে সখ্যতা হতে বাধা থাকবে না। বাইরের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নয়, জঙ্গলেরই অঙ্গ হিসেবে স্বাগত হবেন তাঁরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

রবির লাশ ভেস ওঠার পর কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল। পুলিশ অথৈ জলে। নন্দন বর্মা পুজোর ছুটি কাটিয়ে ক্লাস ফ্রেন্ড রাধু বর্মনের ছেলের কাছ থেকে তদন্তের সারাংশ জেনে নিলেন। পরেশ প্রামাণিকের ভয় ছিল যে রবির ব্যাপারে পুলিশ তাঁকে জ্বালাবে। তাঁর মেয়ে বনানীর সঙ্গে প্রেম প্রেম ভাব ছিল রবির। স্কুল মাস্টার সন্দীপ জানা তাঁর টার্গেট আবার। রিয়াকে খুশি করতে গিয়ে মাস্টার সন্দীপ এক্সক্লুসিভ খবর যোগারে ব্যস্ত। কিন্তু রবি খুন হলো কেন? সে কি কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল? নাকি মধ্যে ছিল কোনো নারী? নন্দন বর্মা অবশ্য একটু একটু গোলমাল আন্দাজ করছেন। সেটা কী? রহস্য কাহিনীর তিন নম্বর পর্ব। খুন হওয়া রবিকে কেউ খারাপ বলছে না কিন্তু!

৯

পুজোর মরসুম শেষ। গতকাল ছটপুজো ছিল। কার্তিকের বেলা ঝপ করে ফুরিয়ে যায়। নন্দন বর্মা পুজো উপলক্ষ্যে কয়েক সপ্তাহ শালগুড়ির বাইরে ছিলেন। আজ দুপুরে ফিরেছেন। ফেরার পরই লেগে পড়েছিলেন বাগান পরিষ্কারের কাজে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে বাইরের ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। গতকালই শালগুড়িতে আসার খবর রাধু বর্মনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। রাধুর আসার কথা সন্ধে নাগাদ। রবির কেসটা নিয়ে নন্দন বর্মার বিস্ময়টা ফুরিয়ে যায় নি। সে কেসের কী অগ্রগতি হল, সেটা জানতে চেয়েছিলেন তিনি রাধুর কাছে। রাধু বলেছে যে তাঁর ছেলেকে নিয়ে আসবে। কেসের খবর সে-ই ভাল জানে। রাধু শুধু মূল কথাটা জানে যে রবি হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পুলিশ অথৈ জলে।

এদিকের গ্রামগুলিতে হত্যাকাণ্ড কদাচ ঘটে থাকে। পলিটিকাল সমস্যা না থাকলে পুলিশের বড়জোর হপ্তাখানেক লাগে খুনিকে বের করতে। রবির লাশ উদ্ধার হওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক চাপান-উতোর শোনা যায় নি। সব দলের লোকেই বলেছিল, খুনের কিনারা হওয়া দরকার। এরপরেও পুলিশের অথৈ জলে অবস্থান অবাক করার মতই ঘটনা। রাধুর ছেলের কাছ থেকে তদন্তের খবর জানতে বেশ ইচ্ছে করছিল নন্দন বর্মার।

'চা করিম?'

শিবানী জিগ্যেস করল। নন্দন বর্মা গ্রামের বাড়িতে এলে রান্নাবান্না আর টুকিটাকি কাজ করে দেয় শিবানী। তবে নিরামিষ রান্না। শিবানী একটি কৃষ্ণ সংগঠনের সদস্য। কম বয়সে বিধবা হওয়ার পর কৃষ্ণ নিয়েই আছে। তাঁর ঘাড়ে কয়েকটা কাটা দাগ আছে। চিতাবাঘ হামলা করেছিল একবার। তারই চিহ্ন।

'একটু পরে কর।'

শিবানী চলে গেল। নন্দন বর্মা মোবাইল খুলে বাঙলা সংবাদ শুনতে শুরু করলেন। কোথাও একটা কমবয়সী ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশের কেউ একজন গম্ভীর মুখে বলছিলেন, 'আমরা ইনভেস্টিগেশান অলরেডি শুরু করিয়ে দিয়েছি। মহিলা জড়িত থাকার ব্যাপারটা আমরা ইগনোর করছি না। তবে আখুনই কিছু বোলা যাবে না।'

কম বয়সী ছেলের হত্যাকান্ডের সঙ্গে কোনও মহিলা ঘটিত ব্যাপারের অস্তিত্ব থাকাটা খুব সাধারণ ব্যাপার। রবির ক্ষেত্রেও কি কোনও মহিলা জড়িয়ে আছে? নন্দন বর্মা বেশ উত্তেজিত বোধ করলেন। এমন হতেই পারে যে রবি কোনো পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ল। তারপর ধরা পড়ে গেল। মেয়েটির স্বামী খুন করে ভাসিয়ে দিল তাঁকে। সেক্ষেত্রে অবশ্য খুনিকে খুবই বুদ্ধিমান বলে ধরে নিতে হবে, কারণ পুলিশ এখনো কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারে নি।

কিন্তু শালগুড়িতে এমন বুদ্ধিমান কে থাকতে পারে? অবশ্য শালগুড়ির বাইরেরও কেউ হতে পারে। যদি মেয়েঘটিত ব্যাপার না হয় তবে রবি নির্ঘাৎ কোনো অপরাধী দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

রবির সঙ্গে অপরাধ জগতের সম্ভাব্য যোগাযোগের

বিষয়টা নন্দন বর্মা আগেও ভেবেছেন। কিন্তু বিষয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন নি। শালগুড়িতে রাধুর দোকানে কাজ করে বড় কোনো গ্যাঙ-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। কেউ না কেউ খেয়াল করত। অবশ্য, কোনও গ্যাঙ-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসে শালগুড়িতে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না! কিন্তু সেটা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই তাঁদের তদন্তে সেটা জেনে যেত। তাঁরা নিশ্চয়ই রবির বাড়ির ঠিকানায় খোঁজখবর নিয়েছে। সুতরাং অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার মাশুল হিসেবে রবির খুন হওয়াটা নন্দন বর্মার যুক্তিতে বৈধ হচ্ছিল না। তুলনায় কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপারের অস্তিত্ব অনেক যুক্তিযুক্ত।

প্রায় ছ'টা নাগাদ মনোজের বাইকে সওয়ার হয়ে রাধু বর্মন এলেন। মনোজ তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'আপনার সঙ্গে আজকাল আর কথাই হয় না। বাবা বলল আপনি রবির কেসটা নিয়ে জানতে চান। তাই চলে এলাম।'

'আসো। ভেতরে আসো।'

মনোজ বসার ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু তাড়া আছে নন্দকাকা! পার্টির মিটিং আছে। আসলে লোকসভা চলে আসছে তো! বুঝতেই পারছেন?'

'রবির কেসটা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন কী হয়েছে সেটা জানো?'

'আরে আমি বলেই না জানি!' মনোজ চওড়া হাসে। 'তবে কেস কিন্তু ক্রিটিকাল আসে! রবির বাড়ি মাথাভাঙ্গার কাসে। বাপ-মা নাই। কাকায় মানুষ করসে। ছেলের কোনো বদনাম নাই। অনেক জায়গায় কাজকাম করসে। বাড়িতে কম থাকত। আমাদের এখানে যে কাম কর্ত, সেটা উয়ার কাকার অজানা সিলো।'

'উয়ার কাকার বাড়িৎ মোক্ যাওয়া নাগে।' রাধু বর্মন হঠাৎ বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন বাক্যটা। সেটা শুনে মনোজ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তর যাওয়ার কী দরকার? টাকা মুই যায়্যা দিয়া আসিম্।' তারপর নন্দন বর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা ঠিক করসে রবির ফ্যামিলিকে কিসু টাকা দিবে। ভালোই ভাবসে। এইটা হলো গিয়া ডিউটি। কিন্তু তার জন্য নিজে যাওয়ার কী আসে কন্ দেখি?'

'সে না হয় তোর বাবা আর আমি গেলাম। সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। রবির কেসটা এবার ক' তো! তর্ না মিটিং আসে ক'লি?'

নন্দন বর্মার সপাট বাক্যে থতমত খেয়ে মনোজ পুলিশি তদন্তের সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করল।

১০

কালীপুজোটা বাড়িতে খরচা করে দেওয়ার পর থেকে পরেশ প্রামাণিকের মনে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। রবির লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়ার পর থেকে দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছিল। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ননবেলেবেল কেস দিয়ে দেবে। পুলিশ অবশ্য এসেছিল। ময়নাগুড়ির ছোকরা এএসআই এসে দু-চার কথা জিগ্যেস করে চলে যাওয়ার পর পরেশের মনে হয়েছিল সে স্বপ্ন দেখছে। কয়েক দিন পর মেয়ে দু-চোখে বন্যা বইয়ে দিয়ে জানিয়ে গেল যে সে ভুল করেছিল। রবি আসলে একটা হারামির বাচ্চা। কী করে মেয়ের মনে এই পরিবর্তনটা এলো, সেটা পরেশ প্রামাণিকের মাথায় ঢোকেনি। তাঁর বরং মনে হয়েছিল, মা কালী মুখ তুলছেন। তারপরেই দেয়ালীর দিন ফাটিয়ে কালীপুজো করেছে সে।

রবির কেস নিয়ে এখন আর শালগুড়ি গ্রামে খুব একটা মাথাব্যাথা নেই কারোর। কিন্তু রবি যে একটা খারাপ লোক, সেটাও শালগুড়িতে কেউ বিশ্বাস করে না। পুলিশও কিছু খুঁজে পায় নি। মানতেই হবে যে রবিকে যারা খতম করেছিল, তাঁদের ব্রেনের জোর আছে। কিন্তু শুওরের বাচ্চাটাকে মারল কেন? পরেশ টুকটাক তাঁর পুরোন ধান্ধার সাগরেদদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে রবির সঙ্গে ক্রাইমের কোনো যোগাযোগ নেই। অন্য কোনো ঘটনা আছে রবির পেছনে।

দু-দিকে ক্ষেত। মাঝে মধ্যে বাড়িঘর। পরেশ প্রামাণিক রাস্তার গর্ত বাঁচিয়ে সাবধানে স্কুটি চালাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করলেন সামনে একটা বাইক রাস্তার কোণায় দাঁড় করান। সেটায় পাছা ঠেকিয়ে মোবাইল দেখছে সন্দীপ মাস্টার। পরেশ স্কুটির ব্রেক চেপে ডাকল, 'কী মাস্টার? আছেন কেমন?'

রবির লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়ার পর থেকে দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছিল। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ননবেলেবেল কেস দিয়ে দেবে। পুলিশ অবশ্য এসেছিল। ময়নাগুড়ির ছোকরা এএসআই এসে দু-চার কথা জিগ্যেস করে চলে যাওয়ার পর পরেশের মনে হয়েছিল সে স্বপ্ন দেখছে। কয়েক দিন পর মেয়ে দু-চোখে বন্যা বইয়ে দিয়ে জানিয়ে গেল যে সে ভুল করেছিল। রবি আসলে একটা হারামির বাচ্চা।

'ভালো।'

'ইসকুল যান নাই?'

'সিএল নিয়েছি।'

পরেশ একটু হাসল। মাস্টারকে জামাই হিসেবে পেলে মন্দ হয় না। রবির সঙ্গে তাঁর মেয়ের যোগাযোগের গল্পটা মাস্টার জানে কি? রাস্তায় পা নামিয়ে স্কুটির ব্যালেন্স ঠিক রেখে সে বলল, 'খবর কিছু পাইলেন নাকি মাস্টার?'

'কোন খবর?'

'রবির মার্ডার কেস নিয়ে কিছু খবর?'

'আপনি পেয়েছেন নাকি?' সন্দীপ জানা এবার কৌতূহলী চোখে তাকাল। 'পুলিশ তো শুনলাম কোনও রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না।'

'চলেন না আমার বাড়িতে একটু চা-টা খেয়ে এ নিয়ে গল্প করবেন। কাছেই বাড়ি আমার। আপনার তো ফোটো তোলার শখ! মেয়েও খুব ফোটো তোলে। মোবাইলে।'

'আমি ক্যামেরায় তুলি।' সন্দীপ জানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

'জানি তো। মনোজের বউ-এর ছবি তুলছেন। আমার মেয়ে জানে। ফোটো দেখছে।'

সন্দীপ জানা চমকে গিয়ে বললেন, 'দেখেছে? কে দেখিয়েছে?'

'মনোজের বউ। আমার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব। দু-জনের মধ্যে ফেসবুক চলে। চলেন না! মেয়ের মুখেই শুনবেন।'

'আজ থাক। যে কাজের জন্য সিএল নিলাম, সেটা হবে না তাহলে। আরেক দিন যাবো।'

'মেয়ের ফেসবুকে একটা রিকুয়েস্ট মেরে দিয়েন। আপনাদের মত ভালো ভালো লোকদের রিকুয়েস্ট মারার জন্যই তো ফেসবুক বানিয়েছে। থাক! আমিই গিয়ে মেয়েকে বলছি মেরে দিতে। মেয়ের নামটা মনে রাখবেন। বনানী প্রামাণিক।'

'ঠিক ঠিক।' সন্দীপ জানা ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বাইকের ইঞ্জিন চালু করতে করতে বলল। পুজোর ছুটির পর শালগুড়িতে ফিরে সে ভেবে আসছিল কী অজুহাতে একবার রিয়ার সঙ্গে দেখা করে আসা যায়। রবির খুনের ব্যাপারে কিছু খবর পেলে সেটা সে রিয়াকে জানিয়ে আসবে এমন প্রতিজ্ঞা সে করে এসেছিল। কিন্তু খবর কিছুই মেলে নি। ছুটির কারণে মাসখানেক সে ছিলও না। এদিকে দেশি মানুষদের মধ্যে বিজয়া দশমী ব্যাপারটার তেমন চল নেই। এতদিন পর সেটার জন্য যাওয়াটা খুবই হাস্যকর দেখাবে। আজ সে ছুটি নিয়েছিল পাশের গ্রামে মেলার ফোটো তুলতে যাবে বলে। আচমকা লোকটা এসে তাঁকে একটা ভালো অজুহাত উপহার দিয়ে গেল।

তাঁর তোলা ছবি কি রিয়া লোকজনকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে? বেড়ালে অবশ্যি ক্ষতি নেই। কিন্তু এ নিয়ে তাঁকে জিগ্যেস করতেই পারে সন্দীপ জানা। আর জিগ্যেস করতে গেলে তো তাঁর বাড়িতে যেতেই হবে! আকাশে ঝলমলে রোদ্দুর। খুব একটা তাপ নেই। রিয়ার বাড়ির দিকে যেতে যেতে উৎফুল্ল সন্দীপ জানা রবি সম্পর্কিত দু-চারটে গুজব মনে মনে ভেবে ফেললেন। যদি বলা যায় যে রবির খুনের সঙ্গে একটা অবৈধ প্রেমের গল্প শোনা যাচ্ছে বাজারে তাহলে কেমন হবে? মেয়েরা এসব গল্প খুব পছন্দ করে। কিন্তু রিয়া যদি জিগ্যেস করে যে গল্পটা কোথা থেকে জানা গেল, তবে? ওকে! তবে কোনো কলিগের নাম বলে দেবে।

রিয়া বাইরের ঘরেই ছিল। সন্দীপ জানাকে বাইক থেকে নামতে দেখে বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, 'ছুটি শেষ হলো তাহলে? ভাবলাম বোধহয় ভুলেই গেছেন!'

রিয়া একটা সাধারণ নাইটি পরে ছিল। সন্দীপ জানা তবুও চোখের সামনে আলো ঝলসে উঠতে দেখলেন। বললেন, 'প্রমিস করেছিলাম রবির খবর পেলে বলে যাব।'

'ভেতরে আসেন।' রিয়া মৃদু হাসল এবার। 'কী খবর পেলেন? পুলিশ নাকি কোনো ক্লু-ই পাচ্ছে না।'

'সত্যি মিথ্যে জানি না। এক কলিগের মুখে শুনলাম। আচ্ছা! রবি কি প্রেম করত?'

'আপনি আসার মিনিট খানেক আগে বনানী মেসেজ করে জানাল যে ওর বাবা এইমাত্র ওকে বলেছে আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে। আমি বললাম পাঠিয়ে দে। ফেসবুক চেক করেন।'

'মানে?' সন্দীপ জানা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

'বনানীর সঙ্গে রবির একটু প্রেম-প্রেম হয়েছিল মিস্টার জানা। এটা পুরোন খবর। বসেন!'

রিয়া ঢেউ খেলিয়ে ভেতরে চলে গেল। সন্দীপ জানা খুব হতাশ হয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'শিট! আমি একটা বোকাচোদা!'

১১

সকাল সাতটা নাগাদ রাধু বর্মনের বাড়ির সামনে ভাড়া

করা গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নন্দন বর্মা নামলেন। আজ তাঁরা দুই বন্ধু রবির কাকার বাড়িতে যাবেন। সকালের চা-জলখাবার রাধু বর্মনের বাড়িতে খেয়ে তারপর বের হবেন, এটাই ঠিক হয়ে ছিল। নন্দন বর্মা গাড়ি থেকে নেমে হাঁক দিয়ে বন্ধুকে ডাকতেই ভেতর থেকে রিয়া বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, 'আসুন। বাবা এক্ষুনি আসবেন। বাগানের দিকে গেছেন।'

'তুমি তো মনোজের বউ, তাই তো? তোমার নাম রিয়া?'

রিয়া এগিয়ে এসে নন্দন বর্মাকে একটা প্রণাম করে বলল, 'আপনার কথা বাবা মাঝেমাঝেই বলেন। ভালোই হলো, আপনি বাবার সঙ্গে যাচ্ছেন।'

'তোমার কর্তার তো এ ব্যাপারে মত ছিল না। সে কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।' একটু লজ্জা পেয়ে বলল রিয়া।

বসার ঘরে ঢুকে একবার চারদিক দেখে নিয়ে নন্দন বর্মা সপ্রশংস দৃষ্টিতে রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ সাজিয়েছ তো? গ্রামে থেকেও কিন্তু টাউনের লাইফ লিড করা যায়!'

রিয়া কিছু না বলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

'রবির ব্যাপারটা কিন্তু খুব মিস্টিরিয়াস!' নন্দন বর্মা একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। 'পুলিশ তো বলছে কোনো সূত্রই পায় নি। ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট তুমি নিশ্চই মনোজের কাছে শুনেছ?'

'আমায় এসব কিছু বলে নি ও। আপনি জানেন?'

'মনোজই বলেছে কাল।'

'আমায় একটু বলুন না!' রিয়ার গলায় আব্দারের সুর শোনা গেল। নন্দন বর্মা কিঞ্চিৎ বাৎসল্য রস আস্বাদন করলেন যেন। চেয়ারে ভালো করে শরীরটা ফিট করে নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে মোলায়েম গলায় বললেন, 'শুনতে ইচ্ছে করছে তো? বেশ। বলছি। তা তুমি কি একেবারেই কিছু শোনো নি?'

'শিঙ্গিহাটে নাকি রবির মোবাইলের লোকেশান লাস্ট পাওয়া গেছিল। বিকেলের দিকে।'

'হ্যাঁ। তোমাদের এখান থেকে ওর বেরিয়ে যাওয়ার টাইমটা ছিল তিনটের একটু আগে। তারপর শিঙ্গিহাটে। সেখানে সাড়ে চারটের পর পর ওর মোবাইলটা অফ হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন সকালের পর ওর মোবাইলে কোনো ফোন আসে নি। যে ফোনটা এসেছিল সেটা মিষ্টির দোকানের কারিগর অনন্তর। রবির সঙ্গে তাঁর ভাবসাব ছিল।'

'এত সব আমি জানতাম না। আমাকে কিছু বলেই নি।' রিয়ার গলায় যেন একটু অভিমানের সুর খেলে গেল।

'এখানে প্রশ্ন হলো— রবি তোমাদের বাড়ির গোডাউন থেকে মাল বের করে নিয়ে শিঙ্গিহাটে চলে গেল কেন? মনোজের কথায়, পুলিশ নাকি এই জায়গাটাতেই খুব কনফিউশড।'

রিয়া কিছু বলল না। উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকল।

'তোমার সঙ্গে কেমন আলাপ ছিল রবির?'

রিয়া একটু চমকে চোখ সরাল। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'প্রায় দিনই তো মাল নিতে আসত। বেশির ভাগ দিন আমিই গোডাউন খুলে হিসেব মিলিয়ে মালপত্র দিতাম। মোটামুটি আলাপ ছিল।'

'বেশ ফিটবাবুটি ছিল ছেলেটি। খেয়াল করতে নিশ্চই?'

'টুকটাক হাতের কাজও জানত। মোবাইল রিপেয়ারিং, টিভি সারাই।'

'মাইনে তো রাধুই দিত?'

'হ্যাঁ। বাবা চেকে মাইনে দিতেন।'

'তোমরা কি কিছু দিতে টিতে? বকশিস?'

'না না। ও একবার শার্ট কিনে দিয়েছিল একটা।' রিয়া একটু ভাবল। তারপর সোজা চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন বলুন তো?'

'আমি ওর ব্যাঙ্কের পাস বইটা দেখেছি। জানি না পুলিশ ব্যাপারটা নোটিশ করেছে কি না।'

'পাস বইতে কী আছে?'

'গত ছ-সাত মাস ও ব্যাঙ্ক থেকে কোনো টাকা তোলে নি। শেষ তিন মাস মাইনের চেকও নেয় নি। তাই মনে হলো অন্য কোনো ভাবে রোজগার করত কি না। একজোড়া শার্টপ্যান্ট ওর ঘরে দেখেছি। ব্র্যান্ডেড। দাম খারাপ হবে না। বেশি দিন হয় নি কিনেছে।'

'একটা মোবাইল কিনেছিল। ভালো দাম।'

'যেটা ওর পকেটে পাওয়া গেছে?'

'হতে পারে। নতুনটাই ব্যবহার করত। আমি তো ভেবেছিলাম টাকা জমিয়ে কিনেছে।'

সকাল সাতটা নাগাদ রাধু বর্মনের বাড়ির সামনে ভাড়া করা গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নন্দন বর্মা নামলেন। আজ তাঁরা দুই বন্ধু রবির কাকার বাড়িতে যাবেন। সকালের চা-জলখাবার রাধু বর্মনের বাড়িতে খেয়ে তারপর বের হবেন, এটাই ঠিক হয়ে ছিল। নন্দন বর্মা গাড়ি থেকে নেমে হাঁক দিয়ে বন্ধুকে ডাকতেই ভেতর থেকে রিয়া বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, 'আসুন। বাবা এক্ষুনি আসবেন। বাগানের দিকে গেছেন।'

'কোনো কারণে গত কয়েক মাস রবির হাতে অন্য কোনো সোর্স থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা এসেছিল বলে আমার অনুমান।' নন্দন বর্মা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন কথাটা। রিয়া একটু চুপ করে থাকল। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আপনার চা আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি। বাবা চলে এলে রাগ করবেন।'

'ঠিক।' পা নামিয়ে জোরদার প্রাতরাশের জন্য তৈরি হলেন নন্দন বর্মা।

১২

মাস্টার হিসেবে সন্দীপ জানার অবশ্য সুখ্যাতি আছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে একটু খোলাখুলি মেশেন বলে তাঁদের মধ্যে গুটি কয়েক ফ্যানও আছে সন্দীপ জানার। তেমনই একজনকে অফ পিরিয়ডে স্কুলের বাইরে বেরিয়ে সিগারেট টানতে গিয়ে দেখে ফেললেন তিনি। ক্লাস ইলেভেনের দীপক রায়। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নির্ঘাৎ বিড়ি টানছিল, স্যারকে দেখে ফেলে দিয়ে স্মার্ট সেজে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে স্কুল ইউনিফর্ম নেই দেখে সন্দীপ জানা বললেন, 'স্কুলে আসিস নি কেন আজকে?'

'একটু পরে মাথাভাঙ্গা যাব সার। মামার বাড়ি। এই উইকে আর আসব না।'

'মাথাভাঙ্গা?' সন্দীপ জানা একটু ভাবলেন। রবির বাড়ি তো মাথাভাঙ্গার ওদিকেই। দীপক বোধহয় তাঁর স্যারের ভাবনাটা পড়ে ফেলে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'রবিকে তো আমার ছোট মামা অনেক দিন ধরে চিনত।'

'তাই?' বেশ আশ্চর্য হলেন সন্দীপ জানা। এই কথাটাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'মনসাপূজার সময় মামা আসছিল আমাদের বাড়ি। বাবার সঙ্গে বাজার করে ফিরে এসে বলল, তোদের রাধু বর্মনের দোকানে দেখলাম একটা চেনা ছেলে কাজ করছে।' মাস্টারকে বলার মত কিছু একটা পেয়ে ছাত্র রীতিমত উত্তেজিত সুরে বলল কথাটা। সন্দীপ জানার মনে হলো, এবার রিয়াকে বলার মত নতুন কিছু পাওয়া যাবে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'রবির ব্যাপারে তোর ছোটমামা কী বলল? রবি কেমন ছেলে?'

'খারাপ কিছু বলে নাই সার। বাপ-মা নাই। কাকাই গার্জিয়ান। আর বলছিল—।'

ছাত্র কথা শেষ না করে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তাকাল মাস্টারের দিকে। সন্দীপ জানা চোখ সরু করে জিগ্যেস করলেন, 'থামলি যে? আর কী বলেছিল তোর মামা?'

'সারদের বলা যায় না সার। আফট্রল আমরা তো আপনার ইস্টুডেন্ট সার!'

'আমার দিকে যখন তাকালি তখনও তোর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।'

'এ সার! না সার! কী যে বলেন সার!'

'বলে ফ্যাল।'

'রবির নাকি অনেক ইয়ে ছিল সার। মানে সার আই লাভ ইউ কেস সার। মেয়েদের খুব পটাতে পারত রবি।'

সন্দীপ জানা মনে মনে নেচে উঠলেন। কিন্তু ছাত্রের সামনে প্রগলভতা বাড়ালেন না। একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে যা। মাথাভাঙ্গায় কিছু খবর পেলে জানাস তো!'

'আমি জেনে আসব সার।' দীপক মহোৎসাহে দায়িত্ব নিয়ে নিলো। 'কিন্তু সার রবিকে কারা মার্ডার করল বলেন তো? কাউকে কিন্তু পুলিশ ধরতে পারে নি।'

সন্দীপ জানা মাস্টারোচিত ভঙ্গিতে ছাত্রের শেষ বাক্যটা ইগনোর করে উল্টো দিকে হাঁটা দিলেন। তারপর হঠাৎ কী ভেবে মোবাইল বের করে ফোন করে ফেললেন রিয়ার নাম্বারে। তিন-চারটে রিঙের পর রিয়ার গলা শোনা গেল, 'কী ব্যাপার? নতুন কোনো খবর পেলেন নাকি?'

'রবি তো শুনলাম কলির কেষ্ট ছিল!'

'কী রকম?'

'মাথাভাঙ্গার দিকে নাকি মেয়েরা টপাটপ রবির প্রেমে পড়ত। বিশ্বস্ত সূত্রে জানলাম।'

'তেমন হলে আমিও জানতাম।'

'মানে?'

'আপনাদের মনোজবাবুর শ্বশুরবাড়ি মাথাভাঙ্গার খুব কাছে। রবির বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু আমি কখনো ওকে আগে দেখি নি, বুঝলেন?'

কিঞ্চিৎ হাসি মিশিয়ে কথাটা শেষ করল রিয়া। ফোনটা মুখের থেকে দূরে সরিয়ে সন্দীপ জানা প্রবল হতাশায় বিড় বিড় করে বললেন, 'ও শিট! আমি একটা ফাকিং বোকাচোদা! না হলে স্টুডেন্টের কথায় নাচি!'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

পাথরঝোরার মেয়েবেলা

ছবির চাইতে সুন্দর চা-বাগান পাথরঝোরা। এই বাগানেই আমার জন্ম। আমরা অনেক ক'টি ভাই-বোন-দাদা। আমার বাবা এই চা-বাগানে স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন। শিশু বয়সের অনেক স্মৃতি আমার মনে পড়ে। বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান। বরিশাল থেকে বাবা কীভাবে চলে আসে কিছুই মনে নেই। বাবা অকালে চলে গেলেও মায়ের কাছ থেকে বরিশালের গল্প শুনতাম।

চা-বাগানের ফ্যাক্টরি থেকে বড় সাহেবের কোঠির দিকে যেতেছিল আমাদের কোয়ার্টার। পাথুরে পথ যত দূর চোখ যায় শুধু চা গাছ। মাঝে মাঝে ছায়া গাছ। কোয়ার্টারের পেছনে লেতি নদী, পাহাড়, লামেটার, মানঝিং, টপলাইন হেঁটে যাওয়া যায়। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে কিছুটা গেলে রুমঝুম, ফাগুজঙ্গল। পার হলে চেল নদী, নোয়ামরেঞ্জ। ওপারে গরুবাথান। জঙ্গলে হাতি, লেপার্ডের বড় ভয়, বেশি দূর যেতে পারতাম না। খুব বেশি হলে সিরুবাড়ি। মাঝে মাঝে দিদি মেজদি বড়দির পিছন পিছন যেতাম। বাবা খুব বকতেন।

পাথরঝোরায় আমার জন্ম, আমার দাদু তাই নাম রেখেছিল পাহাড়ি ঝর্ণা। চা-বাগানের বাবুরা বলত তুই হচ্ছিস পাহাড়ি ঝর্ণা। পড়াশোনাতে যেমন তেমন। শিশু বয়স থেকে পাহাড় দেখতাম, নদী দেখতাম। তখন তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। হ্যারিকেন, কুপি, লম্ফ ছিল। ছিল রেডিও।

পাথরঝোরায় আমার জন্ম, আমার দাদু তাই নাম রেখেছিল পাহাড়ি ঝর্ণা। চা-বাগানের বাবুরা বলত তুই হচ্ছিস পাহাড়ি ঝর্ণা। পড়াশোনাতে যেমন তেমন। শিশু বয়স থেকে পাহাড় দেখতাম, নদী দেখতাম। তখন তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। হ্যারিকেন, কুপি, লম্ফ ছিল। ছিল রেডিও। বাবা নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিতেন। পড়াশোনা ফাঁকি দিলে রক্ষা ছিল না। আবার ভালও বাসতেন।

আমাদের কোয়ার্টারের পিছনে কত ফল ও ফুলের গাছ ছিল। গ্রীষ্মকালে পাকা কাঁঠালের গন্ধে ভরে যেত। ভামেরাও কাঁঠাল খেত। ঘরের সিলিং-এ চলাচল করত খচর মচর শব্দ করতে করতে। ঘর ভরে যেত আতপ চালের গন্ধে। গরু, ছাগল, হাঁস ছিল। মাঝে মাঝে লেপার্ড জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ভীষণ অত্যাচার করত। ভাম তো ছিলই। গুই সাপও ছিল প্রচুর। সাপের তো কথাই নেই। সাপ এবং জোঁক এই দুটিকে আমি সহ্য করতে পারি না। অনেক বাদুড়, পেঁচা, তক্ষক ছিল। তক্ষকের ডাক শুনলে ভয় লাগত।

আমার বাবা যে স্কুলে পড়াতেন সেখানে অনেক গাছপালা লাগিয়েছিলেন। এখনও আছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে দেখতাম বড় সাহেবের বাংলো কত

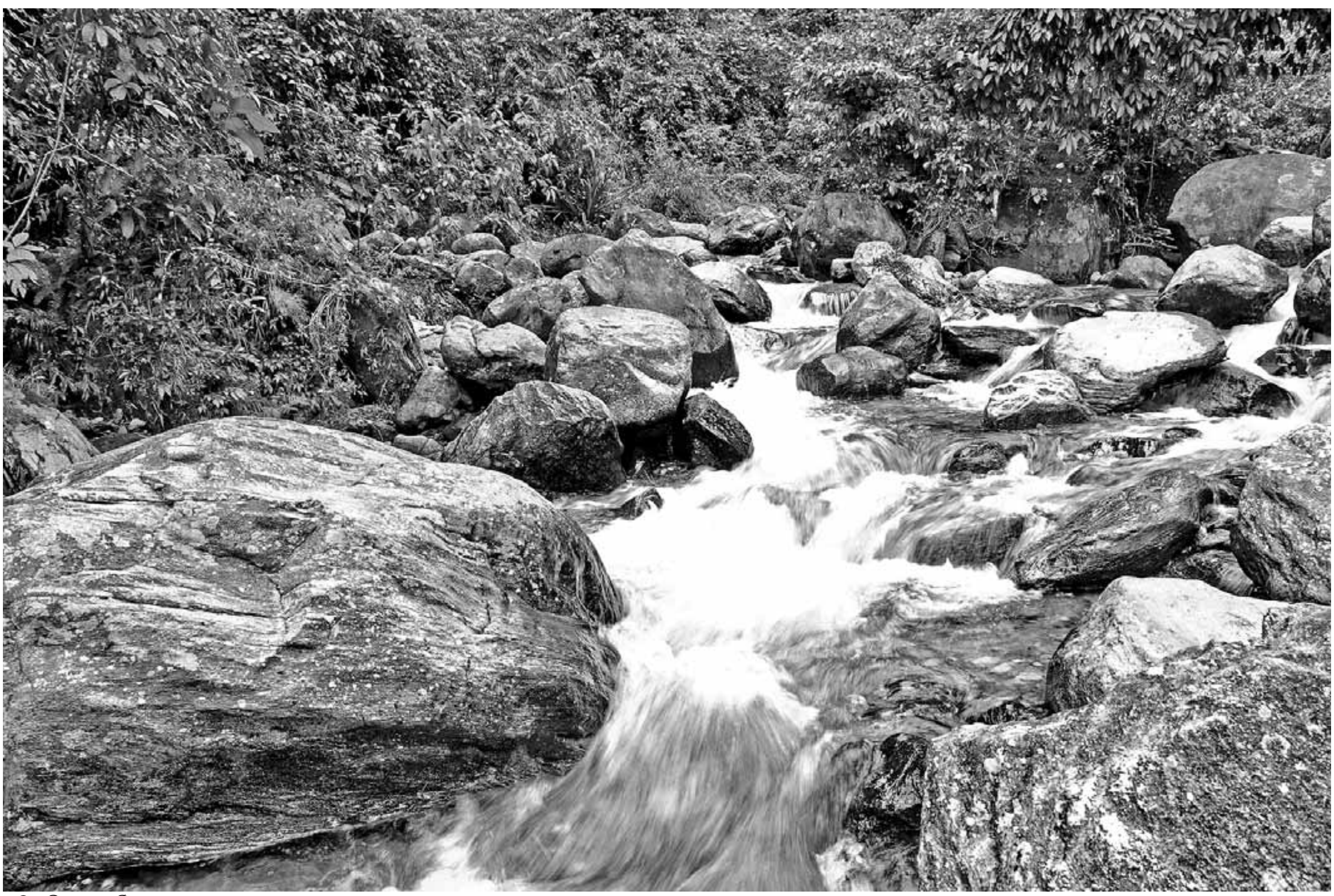

ছবি প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

বড় জায়গা জুড়ে! কী সুন্দর ফুলের বাগান! মালি, আর্দালি, রান্নার লোক, কত সুবিধা সুযোগ! গাড়ি তো ছিল। বড় সাহেব খোদ ইউরোপীয়ান। লাল টকটকে চেহারা। কী ফর্সা গায়ের চামড়া। আমার বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন ম্যাকিনটস সাহেব। বাংলোতে ফলমূল যা হত বাবাকে পাঠাতেন। আমার মনে আছে ম্যাকিনটস সাহেব যেদিন মেমসাহেবকে নিয়ে লন্ডনে যাবেন তার আগের দিন বাবাকে একটি বই গিফট করেন— বইটির নাম 'আওয়ার ইন্ডিয়া'। সবার সঙ্গে বাবা আপন লোকের মত মিশতে পারতেন, কোনও রকম অহংবোধ বাবার মধ্যে দেখি নাই। বর্ষাকালে কোয়ার্টারের সামনে ঝমঝমিয়ে জলের স্রোত হরহরিয়ে বয়ে যেত। আমরা কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিতাম। প্রচুর ফড়িং, প্রজাপতি উড়ত। দৌড়ে যেতাম ধরতে এবং ধরেও ফেলতাম। অনেক রকম পাখি আমাদের বাগানে বাস করত। ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটাত। আমার ভীষণ কৌতুহল ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম। কী সুন্দর পাখির বাচ্চা। মা-দিদিরা ভীষণ বকা দিত— এই ধরবি না! আমার সব থেকে পছন্দ শালিক আর দোয়েল। টিয়া ময়না পোষার খুবই শখ ছিল।

কোয়ার্টারের পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সবজি বাগান ছিল। প্রচুর কোয়াশ, আদা, লঙ্কা, টম্যাটো, পালং শাক, লাউ, কুমড়ো হত। বাগানে দুটো মুদির দোকান ছিল; একটা ছোট হাসপাতাল। সপ্তাহে শুক্রবার দিন গুদরিহাট বসত পাতি কারখানার পাশের মাঠে। ওই দিনের জন্য আমরা ভাইবোনেরা অপেক্ষা করে থাকতাম। ভাজাভুজির দোকান থেকে মাছ, জামাকাপড়, মশলার দোকান। বাবু-শ্রমিকদের আনন্দ দেখে কে! আমরা চপ-সিঙারা-ভুজিয়া কিনে খেতাম। রবিবার ছিল ওদলাবাড়ি হাট। শেষ রাত থেকে চা-বাগানের শ্রমিকরা কলকল শব্দে কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে হেঁটে যেত। কম করে সাত কিলোমিটার দূরে। হাটে যাওয়ার আনন্দে কিলোমিটার তুচ্ছ।

পাথরঝোরার আবহাওয়া ছিল বড় মনোরম। যেমন বর্ষা, তেমনই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। আমার সময়, মানে যে সময় চা-বাগানে থাকতাম চা-বাগানের বাবুদের মধ্যে অনেক বাঙালিবাবু ছিল। ডাক্তারবাবু, কম্পাউন্ডারবাবু, ফিটারবাবু, বড়বাবু, বাগানবাবু, আবার মশাবাবু (ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিতেন), মোটকথা বাবুদের ছড়াছড়ি। সবাই মিলেমিশে বাস করত। কোনওরকম মান অভিমান, ঝগড়া বিবাদ ছিল না। এক দৌড়ে চলে যেতাম জ্যাঠাবাবু, ছেত্রীবাবু, মন্টুদার কোয়ার্টারে। আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন টিকারাম বড়াইলি, লাকপা তামাং, শ্রীকৃষ্ণ ঝা, এবং বদরী বুড়োর ছোট্ট মুদির দোকান। বাবা অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে আমি ভীষণ কান্নাকাটি করতাম। দাদা বাগানে চাকরি নিল। বৌদি স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব পেল। ধীরে ধীরে বাগানের মায়া কাটিয়ে স্থায়ীভাবে একদিন চলে আসি হুগলি জেলার কোন্নগরে। বড় কষ্টের সংগ্রামের জীবন। অনেক ভাইবোনদের নিয়ে একসাথে থাকা। মায়ের ভীষণ চিন্তা হত। মা যেন অকুল পাথারে ভেসে গেল। তাই বলে পাথরঝোরাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। কোনওদিন পারবও না।

কোননগরে আমার স্কুল-কলেজ জীবন সমাপ্ত হলে সমাজকল্যাণ দপ্তরে চাকরি হল এবং ট্রেনিংয়ের জন্য শ্রীনিকেতনে চিপকুঠিতে একটা বছর কাটিয়ে শিলিগুড়ির কাছে ফাঁসিদেওয়ায় পোস্টিং। একাকি থাকা সে আর এক ইতিহাস। আমার এক দিদি জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলে চাকরি করত। দিদির মনে হল আমার বয়স তো বাড়ছে,

বিয়েদেওয়া দরকার। মায়ের কাছে শুনতাম জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিন বিধাতার হাতে। আমার অদৃষ্টে হয়ত লেখা ছিল, ভবঘুরে বোহেমিয়ান কোনও এক উড়নচণ্ডীর সঙ্গে বিয়ে হবে। মানুষটা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, বিয়ের

মায়ের কাছে শুনতাম জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিন বিধাতার হাতে। আমার অদৃষ্টে হয়ত লেখা ছিল, ভবঘুরে বোহেমিয়ান কোনও এক উড়নচণ্ডীর সঙ্গে বিয়ে হবে। মানুষটা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, বিয়ের পর বুঝতে পারলাম। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন। ধুতি-পাঞ্জাবী আর কাঁধে ঝোলা। তার মধ্যে কী আছে আজও জানি না। প্রশ্ন করলে বলে ওই ঝোলাটাই আমার সব। নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। বিবাহবাসর পাথরঝোরা চা-বাগান। সে এক হই হই রই রই ব্যাপার। সাত পাকে বাঁধা। বাসবোঝাই বরযাত্রীরা এল। হ্যাজাক, মশাল আর হ্যারিকেনের আলো।

পর বুঝতে পারলাম। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন। ধুতি-পাঞ্জাবী আর কাঁধে ঝোলা। তার মধ্যে কী আছে আজও জানি না। প্রশ্ন করলে বলে ওই ঝোলাটাই আমার সব। নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। বিবাহবাসর পাথরঝোরা চা-বাগান। সে এক হই হই রই রই ব্যাপার। সাত পাকে বাঁধা। বাসবোঝাই বরযাত্রীরা এল। হ্যাজাক, মশাল আর হ্যারিকেনের আলো।

দ্বিরাগমনে পাথরঝোরায় দুজনে মিলে যখন আসি চা-বাগানের লোকজনেরা ঘিরে ধরে। আমার কত্তা বলে, 'দেখো চা-বাগানের লোকেরা কত সহজ সরল আপনজন'। তার কাজ ছিল চা-বাগানে চরকি পাক দেওয়া। চড়াই-উৎরাই পথে হেঁটে বেড়ান। সকালবেলায় প্রাতরাশ সেরে দুজনে লেতি না হলে রুমঝুম কখনও টপলাইনে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম। প্রচুর চালতা কুড়াতাম। আর নিরিবিলি জায়গা পেলে বসে থাকতাম। সত্যি পাথরঝোরার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আমার কত্তা বলেন 'জানো বিয়ের অনেক আগে আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। মানাবাড়ির চক্রবর্তী পরিবারে ঘুরে বেড়াতাম বাবলুর সঙ্গে তখন কী আর জানতাম তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?' শীতকালে কোয়ার্টারের পেছনে টেবিলচেয়ার নিয়ে তিনি বই পড়া না হলে লেখালেখিতে মগ্ন থাকতেন। আবার কখনও অডিও ক্যাসেটে গান শোনা আর ঘনঘন চা পান। আর বুদ্ধির ঘটে ধোঁয়া দেওয়া। এই তো ছিল কাজ। পাথরঝোরা নিয়ে কলকাতার ভ্রমণ পত্রিকায় যখন তাঁর লেখা প্রকাশিত হল 'অচেনা পাথরঝোরা' তখন কলকাতা থেকে এক পরিবার এই চা-বাগানে বেড়াতে চলে আসে। আমার দাদা ওনাদের আমাদের কোয়ার্টারে রেখে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ছুটিছাটা পেলেই উনি বলতেন চল যাই পাথরঝোরা। তখন সমস্যাও ছিল অনেক। কারণ যানবাহনের এত সুবিধা ছিল না। ওদলাবাড়িতে নেমে চা-বাগানে পৌঁছান সত্যি এক ভজঘট ব্যাপার। সিয়ারামের জোঙ্গার কথা মনে পড়ে। আমরা ওদলাবাড়ির বাটা না হলে মরুদ্যানে অপেক্ষা করতাম। ল্যান্ড ফোনে দাদাকে জানিয়ে দেওয়া হত আমাদের আগমন বার্তা। চা-বাগানের গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে যেত। গাড়ি না পাওয়া গেলে সত্যি খুব কষ্টকর হয়ে উঠত পৌঁছান। কর্তা বলত 'চলো হাঁটতে থাকি। দেখতে দেখতে ঠিক পৌঁছে যাব। কীসের ভয়? মানাবাড়ি, তুড়িবাড়ি, পৌঁছে গেলেই তো পাথরঝোরা।' একবার ওদলাবাড়ি থেকে রিকশা করে পাথরঝোরা পৌঁছেছিলাম। রিকশাওয়ালার অবস্থা করুণ। কারণ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে কোয়ার্টারে পৌঁছান বেজায় কঠিন। রিকশাওয়ালা পাথরঝোরা পৌঁছে কোয়ার্টারের বারান্দায় শুয়ে পড়ে। পাথরঝোরা থেকে হেঁটে সোমবার দিন রুমঝুম, ফাগুখোলা, চেল নদী পাড় হয়ে গরুবাথানের হাটে যেতাম মাছ কিনতে। আসা যাওয়া আট কিলোমিটার। আমার কর্তার ভাল লাগত গরুবাথানের বাজারে এক বিহারীর মিষ্টির দোকানে বসে চা, ভাজাভুজি, লবঙ্গ লতিকা খেতে। আসলে মাছ কেনাটা উপলক্ষ্য। বেড়ানোটাই মুখ্য।

পাথরঝোরা ঘিরে কত শত স্মৃতি আমাকে ঘিরে ধরে বলার নয়। কোয়ার্টারের পাশে বাবলুরা থাকত। সময় পেলে বাবলুদের কোয়ার্টারে না হলে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে কারোর না কারোর ঘরে আমরা সময় কাটাতাম। অনেক স্মৃতি বিজড়িত সেই কোয়ার্টার এখনও আছে এবং মাঝে মাঝে যখন যাই দেখে আসি। পুরনো মানুষজন বলতে এখন তেমন আর কেউ নেই। কয়েক বছর আগে মানাবাড়ির কাছে ঘিস নদীর কাছে ব্যাম্বুট্রেলে কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। সঙ্গীসাথী বলত দুই ভ্রমণপাগল রাজ বসু ও অরুণাভ দাস। দুজনেই বেড়ানোর পোকা। 'ঘোরা রোগে' আক্রান্ত। বর্ষার দিনে পাথরঝোরার পথ লন্ডভন্ড কিন্তু অরুণাভর আবদার, চলুন গৌরীদা পাথরঝোরা দেখে আসি। গিয়ে পৌঁছাই। অনেকে দৌড়ে আসে— পাথরঝোরা কো জামাই (ভেনা) আয়ো। আমি অরুণাভদেরকে দেখাই আমার বাবার লাগানো হরিতকি, আমগাছ। দেখা হয়ে গেল ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। অত্যন্ত আদরযত্ন করে আমাদের স্বাগত জানান। অফিসে নিয়ে বসান। চা খাওয়ালেন এবং নানা গল্পগুজবের পর চায়ের প্যাকেট উপহার দেন। পাথরঝোরার গল্প আপাতত এখানেই সমাপ্তি।

পুনশ্চ একদা পাথরঝোরায় বাস চালু হয়েছিল। কালিম্পং থেকে পাথরঝোরা, ময়নাগুড়ি থেকে পাথরঝোরা। কিন্তু কিছুদিন চলার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন অসংখ্য টোটো, অটো বিভিন্ন চার চাকার গাড়ি অবিরাম যাতায়াত করছে পাথরঝোরায়। কাছাকাছি রেলস্টেশন ওদলাবাড়ি।

ঝর্ণা ভট্টাচার্য

হাংরি রিপোর্টার

যে জলপ্রপাতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম

তুষার প্রধান

উত্তরের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠার আনন্দে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' নামক জলপ্রপাতের সঙ্গে যে মিশে গিয়েছিলাম, তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই! পুরনো কিছু চিঠিপত্র লেখা তার আংশিক প্রমাণ বহন করে। যেমন প্রয়াত শিক্ষক তথা গল্পকার ড. জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর একটি চিঠি আমার সাংবাদিকতার জীবনে পুরস্কার হয়ে আছে। ২০০৪ সালের ১৯ মে আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি থেকে লেখা, সেই চিঠিতে জ্যোৎস্নেন্দুদা লিখেছিলেন, "উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভাবতে ভাল লাগছে যে উত্তরের অহঙ্কার এই কাগজটির সঙ্গে তুমি গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলে; পঁচিশ বছর পূর্তিতে এর সঙ্গেই তুমি আছ। সেই সময়কার টালমাটাল দিনগুলিতে তুমি পত্রিকাটির পেছনে প্রচণ্ড পরিশ্রম দিয়েছিলে। তোমার নিষ্ঠার, দায়বদ্ধতার কোনও তুলনা ছিল না। আমি অন্তত দু-বার সাতসকালে উত্তরবঙ্গ পত্রিকার শিলিগুড়ি অফিসে রাতজাগা ক্লান্ত চেহারায় তোমাকে দেখেছিলাম। ঘণ্টাখানেক তুমি পত্রিকাটিকে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলে। ...পঁচিশ বছরের উত্তরবঙ্গ সংবাদ আজ পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়েছে, দাঁড়িয়েছে ঋজু, দৃপ্ত ভঙ্গিতে। এর পেছনের কারিগরদের ভুলি কী করে! তৈরি পথে চলতে অসুবিধে হয় না, কিন্তু পথ তৈরি করে চলতে গেলে কষ্টের শেষ থাকে না। ...তোমার লেখা তথা সমীক্ষা ও আলোচনা নিয়মিত পড়ি। তোমার লেখনী অনেক ক্ষুরধার এবং পরিণত হয়েছে। তোমার উপলব্ধি তথা মননে প্রত্যাশিত গাঢ়তা এসেছে। নিবিড় চর্চা তোমার লেখাগুলিকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে।..."

জ্যোৎস্নেন্দুদা চিঠির শুরুতে একটা উদ্ধৃতি টেনেছিলেন, 'আপনারে দীপ করে জ্বালো / আপনার যাত্রাপথে আপনিই দিতে হবে আলো।'

কবি অরুণেশ ঘোষ তাঁর একটা লেখার এক জায়গায় লিখে গেছেন, "উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তখন সদ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে সময় মনোজ একদিন ঝড়ের গতিতে আকাশ থেকে নেমে এসে আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর অফিসে। সেই সংবাদপত্রের অফিসই তখন ঘরবাড়ি মনোজের। দেখেছি, গভীর রাত অবধি অমানুষিক পরিশ্রম করার পর শেষ রাতে টেবিলজুড়ে অফিসেই সামান্য কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া অথবা চোখ বুজে থাকা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সে সময় লোকবল কম ছিল, একা হাতে অনেক কাজ সামলাতে হত তাকে। আমার তো মনে হয় মনোজের আত্মত্যাগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আজকের এই উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভিতটা গড়ে দিয়ে গেছে সে।"

একই বছরের ২৭ আগস্ট শিলিগুড়ির মহাকালপল্লী থেকে চোমং লামা (বিমল ঘোষ) লিখেছেন, "প্রিয় ভাই মনোজ, গতকাল সন্ধ্যায় তোমার ফোন পেয়েই

মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। মনোজ, সুশান্ত আর শিশির ব্যানার্জি এসে কোচবিহার হোটেলে উঠত। আমরা রাতের বেলা মই আর আঠার বালতি নিয়ে বের হতাম দেওয়ালে দেওয়ালে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোস্টার লাগাতে। অফুরন্ত এনার্জি ছিল মনোজের। যে কাজ ধরত শেষ না করে ছাড়ত না। সারাদিন সারা রাত জেগে কাজ করত মনোজ। আর ওর লেখনি ছিল ক্ষুরধার। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগলামিটাও ছিল ওর স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলীর একটা আকর্ষণীয় দিক।

আমি সুহাসবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। উনি বললেন, মনোজ এরকম কোনও কাগজপত্র আমাকে দেয়নি। অগত্যা সমস্ত বিষয়টি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। উনি ধারাবাহিকভাবে আমার কোনও লেখা ছাপাবার ব্যাপারে বিশেষ কোনও মন্তব্য করলেন না। আমি উপন্যাস 'তিস্তা তোর্ষার পালাটিয়া' সম্পর্কে এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জোর দিলাম। কিন্তু সুহাসবাবু সব শুনলেন এবং বললেন— কলকাতায় ফিরে যাই। দেখি মনোজ কী বলে। যাই হোক কী হবে না হবে, তা তুমি জানো আর সুহাসবাবুই জানেন। কিন্তু আমি অভিভূত এই জন্য যে তুমি আমার কথা মনে রেখে আমার জন্য যা করছ— এটাই আমার সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এই সৌভাগ্য শিলিগুড়ির কোনও লেখকের হয়নি। ভাল থেকো। ভালবাসা নিও। —বিমলদা"।

ফেসবুকে একবার আমার একটা পোস্ট পড়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধু তপন রায়প্রধান লিখেছিলেন— "উত্তরবঙ্গ সংবাদ শিলিগুড়ির যে ভাড়া বাড়ি থেকে প্রকাশিত হত, কলেজপাড়ার সেই বাড়িটাকেই তুই তোর কাজ আর বাকি রাতটুকুর আস্তানা করে নিয়েছিলি।... পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ঘরের বাথরুমেই থাকত তোর এক সেট জামাপ্যান্ট। চোখের সামনে ভেসে উঠছে অতীত!"

কোচবিহার থেকে বন্ধু সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন— "মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। মনোজ, সুশান্ত আর শিশির ব্যানার্জি এসে কোচবিহার হোটেলে উঠত। আমরা রাতের বেলা মই আর আঠার বালতি নিয়ে বের হতাম দেওয়ালে দেওয়ালে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোস্টার লাগাতে। অফুরন্ত এনার্জি ছিল মনোজের। যে কাজ ধরত শেষ না করে ছাড়ত না। সারাদিন সারা রাত জেগে কাজ করত মনোজ। আর ওর লেখনি ছিল ক্ষুরধার। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগলামিটাও ছিল ওর স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলীর একটা আকর্ষণীয় দিক।"

'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' কাগজটি কোচবিহার জেলাজুড়ে ব্যাপক প্রচার পেতে শুরু করেছিল মূলত তিনজনের হাত ধরে। তখন আমার দুই বন্ধু আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে সহযোগিতা করেছিল। এঁদের মধ্যে একজন সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য। অন্যজন কবি ত্রিদিব চক্রবর্তী। ত্রিদিব আলিপুরদুয়ার জংশনের ছেলে। যখন উত্তরবঙ্গ সংবাদে ৫০ টাকা মাস মাইনেতে সংবাদ পাঠিয়ে ওঁর পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, তখন একদিন ও শিলিগুড়িতে গিয়ে আমাকে ওঁর অবস্থা খুলে বলে। সব শুনে আমি সুহাস তালুকদারকে ত্রিদিবের যোগ্যতা যাচাই করে একটা কাজের সুযোগ দিতে বলি। তবে সে ভাবে স্থায়ী কর্মী হিসেবে নেওয়া যাবে না, তা তিনি পরিষ্কারই জানিয়ে দেন। কোচবিহারে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর বিক্রি বাড়ানো, হকারদের হাতে কাগজ তুলে দেওয়ার তদারকির কাজ ঠিক করে দেন সুহাস তালুকদার। কোচবিহারে 'বুকল্যান্ড'-এ কাগজ যেত। আর বুকল্যান্ডকে কেন্দ্র করেই ত্রিদিব দেওয়ানহাট, দিনহাটা, মাথাভাঙা, ভেটাগুড়ি, মেখলিগঞ্জ, বক্সিরহাট... কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ও প্রত্যন্তে কাগজের প্রচার বাড়ানোর দিকে জান লড়িয়ে দিল। 'বুকল্যান্ড'

এসময় ত্রিদিবকে লাগাতার সহযোগিতা করে গেছে। ‘বুকল্যান্ড’-এর জ্যোতিদা ত্রিদিবকে খুব ভালবাসতেন। ত্রিদিব বুকল্যান্ডের দোকানঘরে রাত কাটিয়ে দিয়েছে, কার্যত রাতে থাকতে বাধ্য হয়েছে হকারদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার্থে। নানা বাহানা ছিল হকারদের। কাগজের মূল দাম বাকি ফেলে রেখে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতেন বহু হকারই। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ তখন নতুন কাগজ, ওভাবে বাকি ফেলে রাখাকে যতটা সম্ভব নিজ কৌশলে আদায়ের তৎপরতা চালিয়ে যেতে হয়েছিল ত্রিদিবকে। সবটা আদায় সম্ভব ছিল না, সে মালিকপক্ষ জানত। তা জেনেও ত্রিদিব কখনও কাজে ফাঁকি দেয়নি। সঙ্গোপনে চালিয়ে গেছে কবিতা লেখার কাজ— ‘মনে রেখো, একদিন / মনে রাখতে হবে / সব স-ব কিছু।’

দুঃখের বিষয় হল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন একদম নিচ পর্যায়ে চলে গেছে। বহু ক্ষেত্রেই সংবাদ ছাপা, চাপ দেওয়া নিয়ে ব্ল্যাক মেল হয়। আর সেই ব্ল্যাকমেলের মাধ্যমে একদল মানুষ টাকা কামিয়ে নেওয়ার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। আমি যখন সাংবাদিকতা পেশার প্রতি গা ঘষটাতে শুরু করি, তখন এইসব কথার আঁচ পর্যন্ত ছিল না। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি যেসব এলাকায় বড় হয়েছি, সেইসব এলাকায় সংবাদপত্রের কোনও আহামরি দাপটও ছিল না। খবর ‘ছাপব’ নাকি ‘চাপব’, চেপে গিয়ে কিছু কামিয়ে নেব, তখন এরকম কলকাতায় হত কিনা জানি না, তবে আমাদের উত্তরবঙ্গের দিকে হচ্ছে বা হয়েছে, এরকম শুনিনি। সংবাদপত্র পড়াটা মূলত কমিক স্ট্রিপ অরণ্যদেবের সূত্রে। তারপর আনন্দবাজার আর টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একনিষ্ঠ পাঠক হতে পেরে ভালই লেগেছিল। এখন অবশ্য আনন্দবাজার আর পড়তে ইচ্ছে করে না। অথচ, একটা সময়, বছর সাত-আটেক আগে পর্যন্তও আনন্দবাজারে ছাপা খবরটিকে ঘিরে একটা মাতন কাজ করত।

আসলে কলকাতার সংবাদপত্রে উত্তরবঙ্গের খবরাখবর জায়গা পেত যৎসামান্য। সেই কারণে মনেপ্রাণে চাইতাম উত্তরবঙ্গের বুকে আনন্দবাজারের মত দেখতে একটা বড় কাগজ হোক। নিদেনপক্ষে বসুমতী কিংবা যুগান্তরের মত। সেইরকম সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেতেই ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ প্রতিষ্ঠাতার জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছিলাম। তখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের শালবনে আড্ডা দিতেই বেশি ভাল লাগত। শিলিগুড়ি কলেজে একবার অঙ্কে অনার্সে, একবার বাংলা অনার্সের ছাত্র ছিলাম বটে, তবে বেশি ভাল লাগত শিলিগুড়ি লাগোয়া বনাঞ্চল, চা-বাগান, সেবক, দুধিয়া। কলেজের মাঠে ক্রিকেট খেলতে খেলতেও মনে হত যাই বালাসন নদীটাকে একটু দেখে আসি। বালাসন ব্রিজের কাছে গেলেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত স্পষ্ট। আর দুধিয়ার ছায়ারেখা।

সংবাদপত্রের জগতে একবার ঢুকে যাওয়া এবং থেকে যাওয়া যে কী সাঙ্ঘাতিক নেশার ব্যাপার, তা যাঁরা একবার ঢুকেছেন, তাঁরা জানেন। সাংবাদিকতার নেশা আমাকে জড়িয়ে ধরায়, পরবর্তীতে বিয়ে থা করে পরিবার করলেও পরিবারের জন্য সেভাবে সময়ই দিতে পারিনি। সে যে কী নেশা। সকাল থেকে রাত-দুপুর, কোনও কোনও নয়, বহুদিন বহুরাত রাত জেগে কাজ করে গিয়েছি। লোকে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, একসময় আমি শুধু সংবাদপত্রকে ভালবাসার তাগিদ থেকে টানা ১৫ দিন কার্যত নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছি। পরিবারের লোকের দিকে কোনও নজরই দিতে পারতাম না। আমার স্ত্রী স্বপ্না যদি আমাদের মেয়ে দুটিকে অতি কষ্ট সহ্য করে মানুষ না করত, তাহলে কী যে দুর্গতিই না হত।

আসলে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ চালু হওয়ার এক বছর আগে থেকে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ পত্রিকাটি বের হলে কেমন চাহিদা হতে পারে, প্রথমদিকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা-শহর-গঞ্জ ঘুরে সমীক্ষার কাজ শুরু এবং শেষ হয়েছিল আমার হাতেই। গঙ্গারামপুরের আদিবাসিন্দা সুহাসচন্দ্র তালুকদার ততদিনে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। ব্যাঙ্কে চাকরি করতে করতে কলকাতার বুকে নানা ধরনের ব্যবসার সূত্রপাত ঘটাতে চেয়েছেন। আমার সঙ্গে সুহাসদার ঘনিষ্ঠতার কারণে তাঁর এইসব পেশাগত জীবনের অনেক কথাই বলতেন। সব কথা তো আমারও মনে নেই। তবে যেটুকু মনে পড়ে, তাতে সুহাসদা জানিয়েছিলেন, অর্থনীতি তাঁর প্রিয় বিষয়। এক সময় অমর্ত্য সেনের অধীনে পিএইচডি করার কাজও শুরু করেছিলেন। কেন তা শেষ করেননি, তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যদিও অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তাঁর

আমি বলব, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কর্মীদের পথে নামতে বাধ্য করেছিলেন হকার ভাইয়েরা। তাদের প্ররোচনার মুখে পা দেওয়ায় ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ অফিসের অদূরেই খুন হয়ে যেতে হয়েছিল এক সংবাদ কর্মীকে। সেই কর্মীর নাম ছিল দিবাকর মন্ডল (খেলন)। দিবাকরের মৃত্যুর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে আনন্দবাজার পত্রিকা ও অন্য বহু পত্রিকা গুরুত্ব দিয়েছিল। তবে আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ এরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।

অর্থাৎ সুহাসদার সম্পর্কের মধ্যে কোনও প্রভাব ছিল না। কেন না, পরবর্তীতে অমর্ত্য সেনের বোনকে (সুপূর্ণা দত্ত) ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কলকাতা অফিসে চাকরি করতে দেখেছি। সুহাসদা বলতেন, ব্যবসা করে দাঁড়াতে পারলে অনেক টাকার মালিক হওয়া যায়। চাকরিতে সেই সুযোগ নেই।

তখন রিপন স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন সুহাসদা। এখন যিনি সম্পাদক সুহাস তালুকদারের পুত্র সব্যসাচী তালুকদার তখন নেহাতই বালক। সেই বালকের সঙ্গে রিপন স্ট্রিটের ওই ফ্ল্যাটে প্রায় রবিবার ক্যারম খেলতে আসতেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তৎকালীন আনন্দবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে সুহাসদার একটা দারুণ সম্পর্ক ছিল। আর আনন্দবাজারের কর্তাব্যক্তি অশোককুমার সরকারের স্ত্রীর সঙ্গে। কাগজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অশোক সরকারের স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতেন সুহাসদা। ওঁদের বাড়িও যেতেন মাঝে মধ্যেই।

হকারদের আন্দোলনের জেরে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-কে যখন খুব ভুগতে হচ্ছিল, তখন আনন্দবাজার রীতিমত বুক ঠুকেই ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছিল।পত্রিকা বিক্রির কমিশন বাড়ানো, অন্য কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য তখন ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ বিক্রেতারা যে আন্দোলন জুড়েছিল, তার গতিপ্রকৃতি মোটেও গণতান্ত্রিক ছিল না। ছিল জঙ্গিপনা। দাবি আদায়ের নামে একবগ্গা প্রক্রিয়ায় ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ পত্রিকা গোষ্ঠীকে লাগাতার আক্রমণ করে চলাটা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাঁরা বিক্রি করতেন কমিশনের বিনিময়ে, তাঁদের কাছে একটা নিত্য কর্তব্যের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিদিন নতুন নতুন ‘অজুহাত’ তৈরি করে মালিকপক্ষকে আক্রমণের তৎপরতা ছিল। এভাবেই হকার ভাইদের আন্দোলন একদিন এত বেশি উগ্রচণ্ডী হয়ে ওঠে যে তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দাবি আদায়ের তাগিদ থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মীদের পথে নামতে বাধ্য করে। এটা মনে রাখতে হবে, হকার ভাইদের আন্দোলন যত তীব্র হচ্ছিল, তত বাড়ছিল ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ নামক কাগজটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক। তাই মালিকের চেয়ে বেশিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মীরা। তারা হকার ভাইদের তুঘলকি আন্দোলনের বিরোধিতায় তাই পথে নেমেছিলেন।

আমি বলব, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কর্মীদের পথে নামতে বাধ্য করেছিলেন হকার ভাইয়েরা। তাদের প্ররোচনার মুখে পা দেওয়ায় ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ অফিসের অদূরেই খুন হয়ে যেতে হয়েছিল এক সংবাদ কর্মীকে। সেই কর্মীর নাম ছিল দিবাকর মন্ডল (খেলন)। দিবাকরের মৃত্যুর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে আনন্দবাজার পত্রিকা ও অন্য বহু পত্রিকা গুরুত্ব দিয়েছিল। তবে আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ এরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। আমি, সুশান্ত আচার্য এঁরা প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হতে কলকাতার সিধো-কানহু ডহরে অস্থায়ী শিবির গড়ে অনশনে বসেছিলাম। আমরা কয়েকজন মিলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলাম, বিচার চেয়ে স্লোগান তুলেছিলাম। তখন কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। নিয়ে গিয়েছিল লালবাজারে। সেখানে লকআপের বাইরে বসিয়ে রেখেছিল রাত হওয়া পর্যন্ত। তারপর বন্ডে ছেড়ে দিতেই আমরা ফিরে গিয়েছিলাম অনশন শিবিরে। সমস্যা মিটলে ছয় কী সাত দিনের মাথায় গৌরকিশোর ঘোষ, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি ফলের রস খাইয়ে আমাদের অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন। সে সময় আমাদের অনশনকে সমর্থন জানাতে অনেকেই এসেছিলেন। মন্তব্য করে সই করা খাতা আমার কাছে নেই। থাকার কথা ছিল সুশান্ত আচার্যর কাছে। সুশান্ত প্রয়াত। ওঁর স্ত্রী এণাক্ষী পরে জানিয়েছিল, না ওঁদের ঘরে ওই ধরনের ডকুমেন্ট কিছু নেই। যেদিন আমাদের রাইটার্সের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেদিনের সেই ছবি পরদিন সকালের টেলিগ্রাফ এবং আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে ছাপা হয়েছিল সেটুকু আমার মনে আছে। তবে সেইসব ছবিও আজ আর আমাদের কাছে নেই।

‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ শুরু করার কথা বলতে গেলে সেটাই হয়ে যাবে মহাভারত। এটা আমার জন্য ভয়ের। কারণ, অনেক লিখতে হবে। অল্প কথায় লোককে একটা কিছু সহজে বোঝানোর কাজটা সহজ নয়, কিন্তু করা তো উচিত সেটাই। সুহাসদা বলতেন, ব্যবসা করার তাগিদ থেকে তিনি এক সময় পাত্র-পাত্রীর তথ্য বিনিময় অর্থাৎ বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন কেন্দ্র খুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন ‘তথ্যকেন্দ্র’। আলতা দিয়ে পোস্টার লিখে এসপ্ল্যানেডের বিভিন্ন দেওয়ালে সেই পোস্টার সেঁটেছিলেন। সেই তথ্যকেন্দ্রর পরে এত রমরমা হয়ে যে তথ্যকেন্দ্র থেকে অ্যাটাচি ভর্তি গোছ

গোছ নোটের তাড়া নিয়ে বাড়ি ফিরতেও দেখেছি সুহাসদাকে।

সুহাসদা আরও একটা ব্যবসা করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। সেটা হল, পর্যটকদের নিয়ে দিঘা, বকখালি বেড়াতে যাওয়া। সেই পর্যটন সংস্থার নাম দিয়েছিলেন, অল ইন্ডিয়া টুরিস্ট সার্ভিসেস। একদিন গল্পে গল্পে সুহাসদা জানিয়ে বসেন, বাসও তিনি চালাতে পারতেন। এরকম হঠাৎ হঠাৎ হত, তাঁর টুরিস্ট সার্ভিসের বাসচালক না আসায়, সহকারী না আসায় সুহাসদা নিজেই বাস চালিয়ে পর্যটকদের গন্তব্যে নিয়ে গিয়েছেন। নিয়ে ফিরেছেন। যাত্রার শুরুতে যাত্রীদের হাতে চা-কফি-স্ন্যাক্স ট্রেতে করে সার্ভও করেছেন। এই কাজটুকু করতে পারার জন্য সুহাসদার মনের মধ্যে একটা 'চাইলেই সব পারি' গোত্রের ধারণা কাজ করত। আমার মনে হয়, সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই একটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র চালু করে দেওয়ার মত 'হিম্মত' নিয়েছিলেন। 'হিম্মত' দেখানোর চেয়ে 'নেওয়া' কথাটাই বেশি উপযুক্ত মনে হল। কারণ, দৈনিকটি শুরু করার আগে থেকে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করানো আর ব্যাঙ্ক-ঋণের ব্যবস্থা করা ছাড়া সংবাদপত্রের অন্য সব ব্যাপারে তাঁর খুব কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে, সংবাদপত্রের প্রায় সমস্ত বিভাগে শুধু বেশ কিছু মনোযোগী কর্মীই পাননি, পেয়েছিলেন এমন কিছু প্রাণ ঢেলে দেওয়া কর্মী, যাঁরা মাইনের ব্যাপারে তত মনোযোগী ছিলেন না, যতটা ছিলেন কাজের ব্যাপারে। যৎসামান্য মাইনেতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি বহু কর্মীকেই। শুরুর দিকে ২০০, ২৫০ টাকা মাইনের কর্মী ছিলেন অনেকেই। অনেকে ৪০০-৬০০ টাকার। ৮০০ বা ১০০০ টাকার মাইনের ক'জন ছিলেন, সবটা মনে নেই। তবে জোড় সংখ্যায় হিসেব করা যায়, সংখ্যাটা মোটেও তেমন ছিল না। উল্লেখ করার মত ব্যাপার, শুরু থেকে সুহাসদা যেটা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন, তারিখের মাইনে তারিখে দিয়ে দেওয়া। ওভারটাইমের রেট কম দিলেও সময়ে পয়সা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যথা হত না।

সুহাসদা লেখার মান বুঝতেন খুব ভাল। কোনও লেখা ভাল হলে মন খুলে প্রশংসা করতেন। যদিও সুহাসদার নিজের বাংলা রচনা ছিল ক্লিশে, বাংলা হাতের লেখাও অনুল্লেখনীয়। তাই শিলিগুড়ি এসে কলকাতা অফিসের বাঙালি কর্মীদের যখন কোনও নির্দেশ পাঠাতেন, তখন বেশিরভাগ বাংলা চিঠি আমাকে ডিকটেশন দিয়ে লেখাতেন সুহাসদা। নিচে শুধু নিজের নামটুকু সই করতেন। ইংরেজির ক্ষেত্রেও তাই হত। পরে একজন টাইপিস্ট রেখে নেওয়ায় ইংরেজি চিঠিপত্র টাইপ করে পাঠানো হত। যেহেতু দৈনিক কাগজটি বের করার এক বছর বা তার সামান্য বেশি কিছুদিন আগে থেকে আমার সঙ্গে সুহাসদার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, আমার নানা ধরনের কাজের পারদর্শিতার জন্য উনি আমাকে আলাদা চোখে দেখতেন। কিছু কিছু বিষয়ে সস্নেহে প্রশ্রয়ও দিতেন তাই। যেমন কারও চাকরির জন্য প্রস্তাব, সুপারিশ করতাম, উনি ক্যান্ডিডেটকে যাচাই করে রেখে নিলেন। তো এসব ১৯৮০ সালের কথা। তার আগে থেকেই পাড়ায় পাড়ায় বেকারত্বের বহর বাড়া শুরু হয়েছে। অন্য দিকে শিক্ষিতের হারও বেড়েই চলেছে।

(ক্রমশ)

এই রচনা প্রতিবেদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অভিমত, এর নৈতিক ও আইনি দায় তাঁর, কোনওভাবেই 'এখন ডুয়ার্স'-এর নয়।

রাসায়নিক রস

মার্কশিট ঠিক রাখবেন

দেখুন দাদা! আপনার ভক্তি আছে কি না, সেটা পরের কথা। আসল হলো ভক্তির মার্ক শিটে আপনি কত নাম্বার পেলেন। ভক্তি অন্তরের ব্যাপার— এ সব মহান পুরুষরা বলেছেন। বহুৎ দিন হল বলেছেন। এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে। পড়ার বইতে লেখা আছে সততা মহৎ গুণ। তার মানে বুঝলেন? সেন্টেন্সটা আপনাকে মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ করলেই নাম্বার। মার্কশিট উপচে পড়বে দাদা! তারপর ফিল্ডে নেমে কাকে চিট দিলেন সেটা তো মার্কশিটে লেখা থাকবে না! ভক্তির ব্যাপারেও তাই। অন্তরের ভক্তি অন্তরেই ডাম্প করে রাখবেন! বাইরে ধষ্যণ করুন, সিলতাহানি করুন, এর ওর টাকা মেরে দিন, ঘুষ নিন, নরমের ওপর গরম দিন— কোনো ফ্যাক্টার না। মাঝে মাঝে বাড়িতে বিগ বাজেটের পুজো দিয়ে দেবেন। মার্কশিটে পুরো লেটার মার্কস!

মহাপুরুষদের যে কেন এত আদশ্য করছেন, বাঁরা, বুঝি না! রামকিস্নের ছবি টাঙান। ঠিক আছে। কিন্তু টিচার হিসেবে আপনার আদশ্য হলো খেঁদু বাবু। প্রাইভেট টুইসুনি করে কী আলিশান বাড়ি হাঁকিয়েছে দেখেছেন? মাইনের টাকা ধরাই থাকে। আপনি রামকিস্ন-বিয়েকানন্দকে আদশ্য করে কী ফাটাচ্ছেন বলুন? তারচে' পলিটিক্স করুন। সব সময় শাসক দল করবেন। ফালতু বিরোধিতা করে নিজের ওপর চাপ বাড়ান কেন? আরে, হিন্দু হল বিশ্বের সেষ্টো ধর্ম। বিরোধিতা করার কী আছে? বাস্তব বুঝুন স্যার! বাস্তব! আপনার টার্গেট হলো ফ্লাওয়ার। ফুল। এমন পজিশনে থাকবেন যাতে ফুল যদি ঘাস হয়, আপনি ঘাসে। গেরুয়া হলে আপনি পদ্মে। জাস্ট ফুলটাকে মাইন্ডে রাখুন। চাপ কমে যাবে।

পাসসো টাকা দিন তো!

আরে দাদা! ভাবছেন আপনার টাকা জলে গেল? সামনের মাসেই বড়ো কন্টাক্ট পাব। একদম সিওর। পুরো এক কিলোমিটার রাস্তা স্যার! লোকসভার পরেই ভেঙে যাবে। এর বেশি পসিবল না দাদা! দু-কোটির কাজ। রাস্তার জন্য বিশ লাখের বেশি খচ্চা করব কী করে? বড়ো বড়ো মার্কশিটওয়ালদের খাঁই জানেন? যত খাঁই তত দাপট! ইচ্ছে করে গোটা রাস্তাটাই ব্যাটাদের পেছনে ঢুকিয়ে দিই।

কন্টাক্ট না পেলেও স্যার পবলেম নেই। আমাদের কালীপুজো স্যার এক্কেবারে হাইওয়ের ক্রশিং-এ। গাড়ি আটকে খারাপ উঠছে না। ভক্তির জন্য পয়সা তুলছি বাঁরা আইন কী করবে? শব্রিমালার কেস দেখছেন না? আরে মন্দিরে মেয়েছেলেরা ঢুকবে কি ঢুকবে না সেটো তো ভক্তরাই ঠিক করবে, তাই না? কোর্টের অত চুলকায় কেন? আমাদের পুজো কমিটিতে দেড়শো মেম্বার স্যার। দেড়শো ভোট। চাঁদা আটকালে সব পদ্মে চলে যাবে স্যার! বাড়িতে একটা সরোস্সোতি লাগিয়ে টুইসুনি স্টার্ট করে দিন। সকালে শুধু একঘণ্টা ভজন বাজিয়ে, ধূপকাটি লাগিয়ে ফার্স্ট ব্যাচ স্টার্ট করে দেবেন। তারপর আইন কিছু বললে আমরা আছি।

হাতে স্যার ওটা কী? বই নাকি? ছেলের জন্য? সত্যজিৎ রায়ের বই? কোন দল করেন স্যার? কোনো দলে নেই বলছেন? এইটা বাল কী করে সম্ভব? আপনি দাদা ইচ্ছে করে বলছেন না। বললেই আমি টের পেয়ে যাব আপনি কোন দল করেন। স্টোরিটার নামটা দেখি। ব্যস! এইবার বুঝে গেছি। দার্জিলিং জমজমাট! মানে গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট নিয়ে লেখা। তার মানে স্যার আপনি এখনো ঘাসেই আছেন। আরে না না! ফালতু চাপ নিচ্ছেন। অলোয়েস শাসক দলে থাকবেন। কিন্তু ধম্মে ইন্টারাপ্ট করবেন না। মুসলিমদের নিয়ে মেপে বলবেন। বেশি তোষণ করে দিলে যদি গম্মেন্ট পাল্টি খায় তবে ঝামেলায় পড়বেন। প্রাইভেট টুইসুনি বন্ধ হয়ে যাবে।

এজ্জন্নোই বলছি স্যার! মার্কশিট ঠিক রাখবেন। নাম্বারই শেষ কথা স্যার। টাকায় নাম্বার না থাকলে কি টাকা চলতো? রামকিস্নোকে প্রণাম দেবেন, রোবিন্দোনাথকে বাজাবেন, নেতাজিকে সাপোর্ট দেবেন —কিন্তু জীবনে উন্নয়ন করতে গেলে লিডারের অ্যাডভাইস নেবেন। গম্মেন্ট তো বলেই দিয়েছে 'সেফ ডাইভ, সেফ লাইফ'। ঠিক মোমেন্টে ঠিক পায়ে ডাইভ মারবেন, দেখবেন লাইফ শালা আমুল বাটার। ডাইভ মারার জন্য কোটি কোটি পাব্লিক ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যার। অতগুলো পা-ই নেই যে মারবে। আমি কি এক কিলোমিটার রাস্তার কন্টাক্টের জন্য ঠিকঠাক পা খুঁজে পেতে কম মাল ছড়িয়েছি!

তা'লে স্যার, হাজারই দিন!

আরে না না! আপনি শাসক দলে আছেন, আমিও আছি। দল বদলে গেলে আমি তো হেল্প করবোই। কারণ, আমরা তো একই গোমাতার সন্তান স্যার! জাস্ট মার্কশিট ঠিক রাখুন। না বুঝে মুখস্থ করুন। বাকিটার জন্য ভগবান আছেন। তা হাজার যখন ভালো মনে দিলেন, তখন একটা ইন্টেলেকচুয়াল মন্ত্র শুনিয়ে দিই। কৌটিল্যের শ্লোক স্যার। মুখস্থ করে নিন। কাজে দেবে।

এই যুগে যেই জন যত ছেঁড়ে বাল
তারে তত মনে রেখে দেয় মহাকাল।

অনু ঘটক

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

জয় জগন্নাথ।
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com **বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।**
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: দীপক কুমার হোড়,** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-8 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch-evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.